বিনোদিনীর কথা

বা

(আমার কথা)

প্রথম খণ্ড।

বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল ও

ষ্টার থিয়েটারের ভূতপূর্ব্বা

অভিনেত্রী

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

কর্তৃক প্রণীত।

১ম সংস্করণ।

প্রকাশক— শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ৸৹ দশ আনা।

ভূমিকা।

মর্ম্ম-বেদনার আবার ভূমিকা কি? ইহা শুধু অভাগিনীর হৃদয় জ্বালার ছায়া! এ পৃথিবীতে আমার কিছুই নাই, অনন্ত নিরাশাময়, কাতরতা জানাইবারও লোক নাই; কেননা, আমি সংসার মাঝে পতিতা বারনারী! আত্মীয়বন্ধুহীনা কলঙ্কিনী! কিন্তু যে দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মহৎ সকল হৃদয়েই সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনিই আবার এ ভাগ্যহীনা কলঙ্কিনীর হৃদয়ে যন্ত্রণাজ্বালায় সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু এ হতভাগিনী কোথায় সান্ত্বনা পাইবে! দুঃখিনীকে কে সহানুভূতি দিবে!

হৃদয়ে হৃদয়ে পিষিয়া যে যাতনার অগ্নি প্রাণের ভিতর ছুটিয়া বেড়ায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন কি না, জানি না। কিন্তু এ অধমা জ্ঞানহীনা অভাগিনীর শক্তিতে তাহা অব্যক্তই রহিল; তবে আর ভূমিকা কি লিখিব।

—:•:—

উপহার।

উপহার কি ? প্রীতির কুসুমদামে প্রিয়জনের পূজা। একদিন যাঁহার স্নেহমমতায় এ তাপিত হৃদয় সান্ত্বনার সুধা-ধারায় পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এ ক্ষুদ্র কাহিনী তাঁহাকেই সমর্পণ করিলাম। কিন্তু যাঁহাকে দিলাম, আমার সে প্রিয়তম কোথায় ? তিনি স্বর্গে; স্বর্গেও তিনি আমার! প্রীতির বন্ধন মরণেও বিচ্ছিন্ন হয় না। ভালবাসা মৃত্যুকে জয় করে। প্রীতির আকর্ষণে পিকৃমিল্যয়নের 'গ্যালেটিয়া' প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে প্রাণ পাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; আমিও কাতর-প্রাণে আমার স্বর্গীয় দেবতার চরণে আমার এ ক্ষুদ্র কাহিনী উপহার দিতেছি। যদি হিন্দুধর্ম্ম সত্য হয়, আমাদের দেবদেবী সত্য হন, তবে সেই প্রাণময় দেবতার চরণে, আমার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উপহার পৌছিবে।

এ জীবনে একদিন সংসারে আমার কামনার সকল বস্তুই ছিল; সে দিন ফুরাইয়াছে; আর কিছুই নাই! যাঁহার অভাবে আজ আমি সংসারে ভাগ্যহীনা দুঃখিনী, কোথায় সেই স্নেহপূর্ণ দেবহৃদয়! হায়, সংসার কি পরিবর্ত্তন-শীল!

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

—:*:—
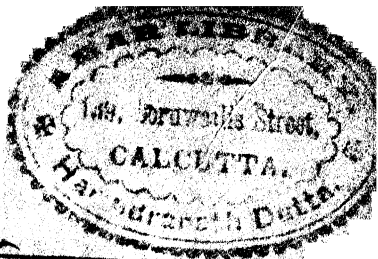
অধীনার নিবেদন।

আমার শিক্ষাগুরু ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে এই আত্মকাহিনী লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখিতে দিই ; তিনি দেখিয়া শুনিয়া যেখানে যেরূপ ভাবভঙ্গীতে গড়িতে হইবে উপদেশ দিয়া বলেন যে, তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দর্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া দাও। আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব। একটি ভূমিকা লিখিয়াও দিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা আমার মনের মতন হয় নাই। লেখা অবশ্য খুব ভালই হইয়াছিল ; আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না। আমি সেকথা বলাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়। সংসারে আমাদের স্থায় রমণীগণের মান অভিমান করিবার স্থল অতি বিরল। এইজন্ত যাঁহারা স্বভাবের উদারতা গুণে আমাদিগকে স্নেহের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের উপর আমরাও বিস্তর অত্যাচার করিয়া থাকি। একে রমণী অদূরদর্শিনী, তাহাতে সে সময় অভিমানে আমার হৃদয় পূর্ণ ; গিরিশ বাবু মহাশয়ের রুগ্ন-শয্যা ভুলিয়া, তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া, সত্য ঘটনা সকল উল্লেখ করিয়া আর একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্ত আমি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। তিনিও তাহা লিখিয়া দিতে স্বীকার করিয়া-

ছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার শিক্ষাগুরু ও সম-সাময়িক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যদি সকল ঘটনা ভূমিকায় উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে, আমার আত্মকাহিনী লেখা অসম্পূর্ণ হইবে। শীঘ্র ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলাম। স্নেহময় গুরুদেব আমায় বলিলেন,—তোমার ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া আমি মরিব না। রঙ্গালয়ে আমি ৺ গিরিশবাবু মহাশয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলাম। তাঁহার প্রথমা ও প্রধান ছাত্রী বলিয়া একসময়ে নাট্যজগতে আমার গৌরব ছিল। আমার অতি তুচ্ছ আবদার রাখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। কিন্তু এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! আমার মান অভিমান রাখিবার দুইজন ব্যক্তি ছিলেন, একজন বিদ্যায়, প্রতিভায় উচ্চ সম্মানে পরিপূর্ণ, অন্যজন ধনে মানে যশে গৌরবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। এক্ষণে তাঁহারা কেহই আর এ সংসারে নাই। আমার তুচ্ছ আব্দার রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গের গ্যারিক্ গিরিশ বাবু আর ফিরিয়া আসিবেন না। 'ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া মরিব না' বলিয়া তিনি আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার পুনর্ব্বার-লিখিত ভূমিকা সম্পূর্ণ হইলে, আমার আত্মকাহিনীর নব সংস্করণ করিব। কিন্তু আমার শিক্ষাগুরু ভূমিকা লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমায় শিখাইয়া গেলেন যে, সংসারের সকল সাধ সম্পূর্ণ হইবার নয়।

সম্পূর্ণ ত হইবার নহে, তবে যাহা আছে, তাহা লোপ পায় কেন? আমি গিরিশ বাবু মহাশয়ের পূর্ব্বলিখিত ভূমিকাটি অন্বেষণ করিতে গিয়া শুনিলাম যে, গিরিশ বাবুর শেষ বয়সের

নিত্যসঙ্গী পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। সেটি তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমার ক্ষুদ্র কাহিনীর সহিত গাঁথিয়া দিলাম। আমার শিক্ষাগুরু মাননীয় ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে ও বিশেষ অনুরোধে লিপিবদ্ধ হইয়া আমার আত্মকাহিনী প্রকাশিত হইল। কিন্তু তিনি আজ কোথায়? হায়—সংসার! সত্যই তুমি কিছুই পূর্ণ কর না! এ ক্ষুদ্র কাহিনী যে স্বহস্তে তাঁহার চরণে উপহার দিব, সে সাধটুকুও পূর্ণ হইল না।

বিনীতা

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।

বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী।

(নাট্যসম্রাট্ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।)

বঙ্গ-রঙ্গভূমির কয়েকজন উজ্জ্বল অভিনেতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, কখনও শোকসভায়, কখনও বা সংবাদপত্রে, কখনও বা রঙ্গমঞ্চ হইতে আমার আন্তরিক শোকপ্রকাশের সহিত তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। যখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর শোকসভা সমাবেশিত হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, তিনিও তাঁহার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সেই শোকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত থাকে। অমৃত বাবু মনে করেন, আমার দ্বারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইলে এবং কোন্ সময় কি অবস্থায় তাহারা কার্য্য করিয়াছে, তাহা বিবৃত থাকিলে, এক প্রকার বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে। এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃত বাবুর অনুরোধ। কিন্তু সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহস করি নাই। আমার যাহারা ছাত্র এবং যাহাদের সহিত একত্র কার্য্য করিয়াছি, তাহা-

ষ্ঠের বিষয়ও লিখিতে গেলে হয়তো একজনের প্রশংসায় অপরের মনে আঘাত লাগিতে পারে, হয়তো বহুদিনের কথা স্মৃতির ভ্রমে, স্বরূপ বর্ণিত হইবে না। তার পর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বর্ত্তমান অবস্থা সমাজের চক্ষে এরূপ উন্নত নয় যে, এক নাট্যামোদী পাঠক ব্যতীত অপর সাধারণের নিকট তাহার মূল্য থাকিবে। আর এক বাধা এই যে, তাহাদের নাট্যজীবনের সহিত আমার নাট্যজীবন এরূপ বিজড়িত যে, অনেক স্থলে আমার আপনার কথাই বলিতে বাধ্য হইব। এ বাধা বড় সাধারণ বাধা নহে। পৃথিবীতে যত প্রকার কঠিন কার্য্য আছে, তন্মধ্যে আপনার কথা আপনি বলিতে যাওয়া একটি কঠিন কার্য্য। অনেক সময়ে প্রকৃত দীনতাও ভাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়; স্বরূপ বর্ণনায় অতিরঞ্জিত জ্ঞান হয়; আর সমস্তটাই আত্মম্ভরিতার পরিচয়—এইরূপ পাঠকের মনে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। এরূপ হইবার কারণ বিস্তর! অনেক সময় আপনি আপনার দোষ দেখা যায় না এবং আত্মদোষ বর্ণনাও অনেক সময়ে উকীলের বিচারপতির সম্মুখে নিজ মক্কেলের দোষ স্বীকারের ন্যায় ওকালতী ভাবেই হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আন্দোলনে ফল কি? এই সকল চিন্তায় এ পর্য্যন্ত বিরত আছি; কিন্তু অমৃত বাবুও সময়ে সময়ে আসিয়া অনুরোধ করিতে ত্রুটি করেন না।

এক্ষণে ভূতপূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ-অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী তাহার নিজ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে দেখাইয়া একটি ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করে। যাঁহারা থিয়েটারে "চৈতন্যলীলা"র নাম শুনিয়াছেন, তিনিই বিনোদিনীর নাম জানেন। "চৈতন্যলীলা" যে কেবলমাত্র নাট্যামোদীরা জানেন, এরূপ নয়;

একটি বিশেষ কারণে "চৈতন্যলীলা" অনেক সাধু শাস্ত্রের নিকটও পরিচিত। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রঙ্গালয়ের পতিতগণকে তাঁহার মুক্তিপ্রদ পদধূলি প্রদানার্থ 'চৈতন্যলীলা" দর্শনচ্ছলে পদার্পণে রঙ্গালয়কে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যলীলায় বিনোদিনী 'চৈতন্যের' ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহুপূর্ব্বে আমি বিনোদিনীকে বলিয়াছিলাম যে, যদি তোমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করো, এবং সেই সকল ঘটনা আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের পথ মার্জ্জিত করিতে পারো, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে। এই কথার উল্লেখ করিয়া এক রকম আমার উপর দাবী রাখিয়া বিনোদিনী তাহার জীবন-আখ্যায়িকার একটি ভূমিকা লিখিতে বলে। আমি নানা কারণে ইতস্ততঃ করিলাম; আমি বিনোদিনীকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, অবশ্য তুমি ইহা তোমার পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার হৃদয়ব্যথা প্রকাশ করা—তোমার মন্তব্য। কিন্তু তুমি সংসারে ব্যথার ব্যথী কাহাকে পাইলে যে, হৃদয়ব্যথা জানাইতে ব্যাকুল হইয়াছ? আত্মজীবনী লেখা যেরূপ কঠিন আমার ধারণা, তাহাও বুঝাইলাম,—আত্মজীবনী লিখিতে অনেককে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, তাহাও বুঝাইলাম। জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক ডিকেন্স গল্পচ্ছলে আপনার নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। অনেকে বন্ধুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে কেহ বা পুত্রের প্রতি লিপির ছলে আত্মজীবন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, অতি উচ্চ ব্যক্তি প্রভৃতিও নিজ জীবনী লিখিতে

ব্যঙ্গের ভয় করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনীতে আমি যে ভূমিকা লিখিব, তৎসম্বন্ধে সাধারণকে কি কৈফিয়ৎ দিব? আমিও কৈফিয়তের ভয়ে লিখিতে চাহি না, বিনোদিনীও ছাড়িবে না। কিন্তু সহসা আমার মনে উদয় হইল যে, এই সামান্য বনিতার ক্ষুদ্র জীবনে যে মহান্ শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে! লোকে পরস্পর বলাবলি করে,—এ হীন—ও ঘৃণিত; কিন্তু পতিতপাবন ঘৃণা না করিয়া পতিতকে শ্রীচরণে স্থান দেন। বিনোদিনীর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্ব্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে। সেই চরণ-মাহাত্ম্য যাঁহার হৃদয়ে আংশিক স্পর্শ করিয়াছে, তিনিই বিভোর হইয়া ভাবিবেন যে, ভগবান্ অতি হীন অবস্থাগত ব্যক্তিরও সঙ্গে থাকিয়া সুযোগপ্রাপ্তি মাত্রেই তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এরূপ পাপী তাপী সংসারে কেহই নাই, যাহাকে দয়াময় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনী যদি সমাজকে এ শিক্ষা প্রদান করে, তাহা হইলে বিনোদিনীর জীবন বিফল নয়। এ জীবনী পাঠে ধর্ম্মাভিমানীর দম্ভ খর্ব্ব হইবে, চরিত্রাভিমানী দীনভাব গ্রহণ করিবে এবং পাপী তাপী আশ্বাসিত হইবে।

যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পন্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুর বাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্বাসিত হইবে যে, যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করি, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জনসমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিব। যাহারা অভিনেত্রী, তাহারা বুঝিবে—কিরূপ মনোনিবেশের সহিত

নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি দোষ হইয়া থাকে, অনেক দোষেই মার্জ্জনা-প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতেও মার্জ্জনা পাইব—ভরসা করি।

বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী একস্রোতে লিপিবদ্ধ হইলে, উত্তম হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া অবস্থাভেদে সময়ভেদে লেখা হইয়াছে, তাহা পড়িবামাত্র বোঝা যায়। বিনোদিনী মনের কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়া সহানুভূতি চাহিয়াছে; কিন্তু দেখা যায়, কোথাও কোথাও সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। যে যে ভূমিকা বিনোদিনী অভিনয় করিয়াছিল, প্রতি অভিনয়ই সুন্দর, কিরূপে তাহা অভ্যাস করিয়াছে, তাহাও বর্ণিত আছে,—কিন্তু সে বর্ণনা অনেকটা কবিতা। কিরূপ চেষ্টায় কিরূপ কার্য্য হইয়াছে, কিরূপ কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন, কিরূপ কণ্ঠস্বর ও হাব-ভাবের প্রতি আধিপত্য আবশ্যক—এ সকল শিক্ষোপযোগীরূপে বর্ণিত না হইয়া আপনার কথাই বলা হইয়াছে। যে অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী লেখার কৌশল, সে কৌশল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমি তাহার প্রধান প্রধান ভূমিকাভিনয়ে, যতদূর স্মরণ আছে, সে চিত্র পাঠককে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিনোদিনী যথার্থ বলিয়াছে যে, তাহার ভূমিকা উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইবার বিশেষ কৌশল ছিল। একটি দৃষ্টান্তে তাহার কতক প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনী গোপার ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিন ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু "বুদ্ধদেব" দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দর্শনের পর সহসা সজ্জাগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে

তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া, কন্সার্টের সময়, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কন্সার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইল? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সাজঘরে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপরে একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে 'গোপা' সাজিয়াছিল, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয়কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় দেখিয়া অপর ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজসজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (part) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত অঙ্গভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যস্ত করা এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ— শ্রম ও চিন্তা-সাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা-ব্যয়ে বিনোদিনী কখন

কুণ্ঠিত ছিল না। বিনোদিনীর স্মরণ নাই, মেঘনাদের সাতটি ভূমিকা বিনোদিনীকে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিতে হয়, বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হউক, সাতটি ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাতটি ভূমিকা একজনের দ্বারা অভিনীত হওয়া কঠিন; দুইটি বৈষম্য-পূর্ণ ভূমিকা এক নাটকে অভিনয় করা সাধারণ নাট্যশক্তির বিকাশ নয়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা এক ভূমিকায় চরমোৎকর্ষ লাভ করা বিশেষ নাট্যশক্তির কার্য্য। চরমোৎকর্ষ লাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকার কিরূপ অবয়ব হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে, তাহা মনঃক্ষেত্রে চিত্র-করের ন্যায় সেই আভাস আনা প্রয়োজন। অভিনয়কালীন ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী হইবে এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসঙ্গত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে, কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে, সেইক্ষণেই অভি-নয়ের রস ভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য করিতে পারেন, এরূপ দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন; এবং সে সময়ে অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা—পলাশীর যুদ্ধ দেখিয়া সাধারণীতে সমালোচনা,—"ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতারা সকলে সুপাঠক; যিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও জানেন।" এইটুকু একপ্রকার সুখ্যাতি ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশী

ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।" কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, অতি উচ্চ প্রশংসা দানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সমালোচকশ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের চালক ছিলেন। বহু ভূমিকায় বিনোদিনী ঐ সকল সমালোচকের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটি কথা আছে, "বিয়ে কি মা?"—এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপ-বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে "বিয়ে কি মা?" শুনিলে গ্যাকাম মনে হয়। সাজসজ্জায় হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্ন বালিকা সংসার-জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় মাতাকে "বিয়ে কি মা?" প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

> "কহ, নাথ!
> কি হেতু কহিলে—
> "ধন্য, ধন্য কলিযুগ"?
> ক্ষুদ্র নর অন্নগত প্রাণ,
> রিপুর অধীন সবে;

রোগশোক সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে ;—
কেন কহ বিশ্বনাথ,—"ধন্য কলিযুগ ?"

যোগিনীবেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,—ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর ;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতিনিন্দা কেন সব ?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ; অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।

"বুদ্ধদেব" নাটকে পতিবিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসনভূষা মম অধিকার !
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাচ্ঞা একপ্রকার অতুলনীয় হইত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনী বেশ—আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পূর্ব্বাঙ্কে অপ্সরানিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ-যাচ্ঞার সময় তাপ-শুষ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনা বোধ হইত। "Light of Asia"-রচয়িতা Edwin Arnold সাহেব এই গোপার অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার Travels in the East" নামক গ্রন্থে বঙ্গনাট্যশালা অতি প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রঙ্গালয় দর্শনে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নত, নচেৎ বুদ্ধদেবচরিত্রের ন্যায় দার্শনিক অভিনয় স্থিরভাবে হিন্দুদর্শকমণ্ডলী দেখিতেন না। বিদেশীর চক্ষে এইরূপ হিন্দুর হৃদয়ের অবস্থার পরিচয় দেওয়া রঙ্গালয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। রঙ্গালয়ের পরম-বিদ্বেষী ব্যক্তিকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে, সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু "চৈতন্যলীলায়" চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। প্রথমে বাল-গৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম-মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা "অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা—পুরুষ প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত।" এই পুরুষপ্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন "কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই ?" বলিয়া সংজ্ঞাহীনা

হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম-ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন; পদধূলিলাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিতমণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেইজন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—"চৈতন্য হোক।" অনেক পর্ব্বত-গহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই সাধনাই, অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইলে অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন—যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থায়ই হোক, এই মহা ছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যানপ্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে ফতীর ভূমিকায়, এবং "বিবাহ-বিভ্রাটে" বিলাসিনী কারফর্ম্মার ভূমিকায়, "চোরের উপর বাটপাড়ি"তে গিন্নী, "সধবার একাদশী"তে কাঞ্চন প্রভৃতি

হাল্কা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্‌সা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত। এক্ষণে যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহাদের ধারণা যে, মতি-বিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাঁহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয় ধারণা যে, কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যাবধি স্নেহপালিত না হওয়ায়, নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকার্য্য করিত, কিন্তু যখন তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী যেরূপ পিঞ্জরমুক্তা হইয়া বনে প্রবেশ মাত্র বন্যবিহঙ্গিনী হইয়া যায়, সেইরূপ গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলা-অংশ-অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই পুর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল— এই পরিবর্ত্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইত। তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল। এখন হীরার ফুলের অভিনয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে অভিনয় দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতি হীরার ফুল:গীতিনাট্যের নায়িকা; কিন্তু যিনি 'হীরার ফুলে' বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ধারণা যে 'হীরার ফুলে' গ্রন্থকার-রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়। অনেক সময়েই আমি বিনোদিনীর সহযোগী অভিনেতা ছিলাম। "মৃণালিনীতে" আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ "মনোরমা" সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা

নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি ; সমস্ত বলিতে গেলে অনেক কথা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়, কেবল 'মনোরমার' কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?" বলিয়াই প্রেম-বিহ্বলা বালিকা। হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই "পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া" অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে আসিয়া বঙ্কিম বাবু কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিতেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে, এ প্রকৃত 'মৃণালিনীর" মনোরমা। বালিকাভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল, বুঝি কোন বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয়-কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন, উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীরও উচ্চ প্রশংসা। বিনোদিনী একবাক্যে দর্শকের নিকট সেই উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বিনোদিনীর গঠনও অভিনেত্রীর সকল ভূমিকা গ্রহণেরই উপযুক্ত—যুবক যুবতী, বালক বালিকা, রাজরাণী হইতে কুটী পর্য্যন্ত সকল ভূমিকার উপযুক্ত। বঙ্গ-রঙ্গভূমির যদি সমাজের চক্ষে অন্যরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে বিনোদিনীর অভিনয়-জীবনের আত্মবর্ণনা অনাদৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু এ কথা বলিতে সাহস করা যায়, যদি বঙ্গ-রঙ্গালয় স্থায়ী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে।

বিনোদিনী আপনার শৈশব-অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। সে সমস্ত আমি অবগত নই। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ চাঁদনীর উপর আমার সহিত তাহার প্রথম দেখা। তখন বিনোদিনী বালিকা। বিনোদিনী সত্য বলিয়াছে, সে সময় তাহাকে নায়িকা সাজাইতে সজ্জাকরকে যাত্রার দলের ছোক্‌রা সাজাইবার প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু সে সময়ে তাহার শিক্ষাগ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া, ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেত্রী হইবে, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আমিও কিছুদিন থিয়েটার ছাড়িয়াছিলাম, বিনোদিনীও সেই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার নারী অভিনেত্রী লইয়া, ৺মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত "সতী কি কলঙ্কিনী ?" অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। থিয়েটারের নানাদেশভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা বিনোদিনী বর্ণনা করিয়াছে, তাহা আমি নিজে কিছু জানি না। পরে যখন ৺কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত একত্র হইয়া থিয়েটার আরম্ভ করি, সেই অবধি বিনোদিনীর থিয়েটারে অবসর লওয়া পর্য্যন্ত আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনোদিনীর অনেক কথাই অবগত আছি। বিনোদিনী হয়তো কেদারবাবু বা অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবে যে, আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাচ্‌ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্য এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বিনোদিনী আমাদের থিয়েটারে আসার পর এক মাসের বেতন যাহা বেঙ্গল থিয়েটারে বাকী ছিল,

তাহা বহুবার তাগাদা করিয়াও বিনোদিনীর মাতা প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার হইতে চলিয়া আসায় তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিনোদিনীর উপর ক্রুদ্ধই হইয়াছিল। ইহার পর আমাদের থিয়েটার একস্রোতে চলে নাই, মাঝে মাঝে হইয়াছে ও আবার বন্ধ হইয়াছে। ৺প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণের পর হইতে আমি থিয়েটারে প্রথম বেতনভোগী হইয়া যোগদান করি এবং সেই সময় হইতে বিনোদিনী আমার নিকট বিশেষরূপ শিক্ষিতা হয়। বিনোদিনী তাহার জীবনীতে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষের প্রতি তাহার শিক্ষক বলিয়া গাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, আমারও শিক্ষাদানের কথা অতি সম্মানের সহিত আছে; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।

উল্লেখ করিয়াছি, সমাজের প্রতি বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষ আছে। বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাহার একটি কন্যা সন্তান হয়, সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কন্যা নীচকুলোদ্ভবা—এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত, কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু তাহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয়-প্রবেশের বাধা প্রদান করিয়াছিল—শুনিতে পাই। এই বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষের কারণ। কিন্তু নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনী-চালন না হইলেই ভাল ছিল। যে পাঠক এই জীবনী পাঠ করিবেন, শেষোক্ত লেখনীর কঠোরতায়, প্রারম্ভে যে সহানুভূতি প্রার্থনা আছে, তাহা ভুলিয়া যাইবে।

এই ক্ষুদ্র জীবনীতে অনেক স্থলে রচনাচাতুর্য্য ও ভাব-মাধুর্য্যের পরিচয় আছে। সাধারণের নিকট কিরূপ গৃহীত হইবে—জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিপথে অনেক ঘটনাবলী হর্ষশোক-বিজড়িত হইয়া বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় উদয় হইয়াছিল।

উপসংহারে আমার সাধারণের নিকট নিবেদন যে, যিনি রঙ্গ-সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ, জানিতে চাহেন, তিনি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন ও ইচ্ছা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনপ্রবাহ সুখদুঃখে জড়িত হইয়া সাধারণের কৃপাপ্রার্থনায় অতিবাহিত হয় এবং সাধারণের আনন্দের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; এই দর্পে সাধারণকে তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র দুই একটি কথা শুনাইবার দাবি রাখে। যে সহৃদয় ব্যক্তি এ দাবি স্বীকার করিবেন, তিনি এ ক্ষুদ্র কাহিনী পাঠে কৃপাপ্রার্থিনী অভিনেত্রীর নাট্যজীবন বর্ণনার প্রথম উদ্যম কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করিবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বিনোদিনী দাসী।

Motila Press, Calcutta.
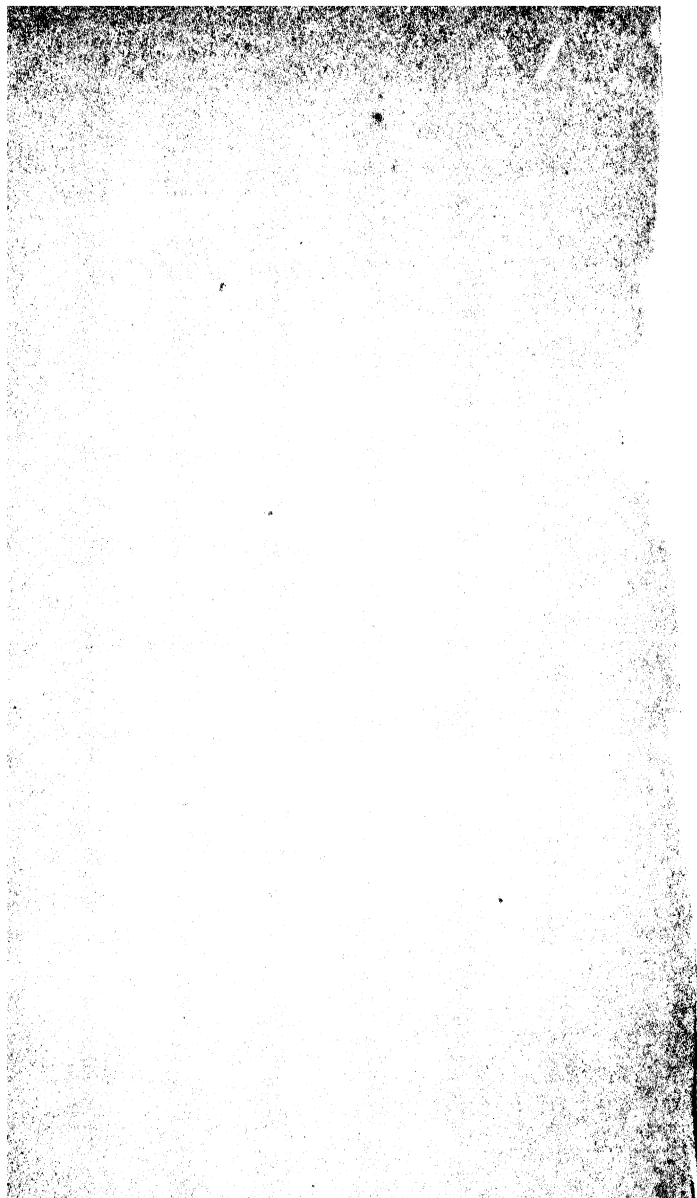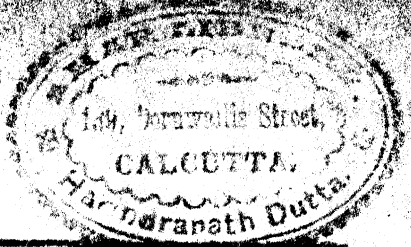
আমার কথা!

বাল্য-জীবন।

অঙ্কুর।

১ম পত্র।

১লা শ্রাবণ। ১৩১৬ সাল।

মহাশয়!

বহু দিবস গত হইল, সে বহুদিনের কথা, তখন মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞাতভাবে জীবন লুকায়িত ছিল না। সে সময় মহাশয়, বার বার কত বার আমাকে বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন

না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে এ সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য্য করে; আবার কার্য্য শেষ হইলে, দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।" আপনার এই কথাগুলি আমি কতবার আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আমি তো আমার জীবন দিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে আমার ন্যায় হীন ব্যক্তির দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি তাঁর কি কার্য্য করিয়াছি, এবং কি কার্য্যই না করিতেছি; আর যদি তাহাই হয় তবে এতদিন কার্য্য করিয়াও কি কার্য্যের অবসান হইল না? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? এরূপ হীন কার্য্য কি ঈশ্বরের?

বার বার আমার অশান্ত হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, "কৈ সংসারে আমার কার্য্য কৈ?" এইতো সংসারের পান্থশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। তবে এতদিন আমি কি করিলাম? কি সান্ত্বনা বুকে লইয়া এ সংসার হইতে বিদায় লইব! আমি কি সম্বল লইয়া মহাপথের পথিক হইব! মহাশয় অনেক বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমায় বুঝাইয়া দিন, যে ঈশ্বরের কোন্ কার্য্যে আমি ছিলাম ও আছি এবং থাকিব।

অনুগৃহীতা।

২য় পত্র।

৭ই শ্রাবণ।

মহাশয়!

মরুভূমে পতিত পথিকের তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ যেমন দূরে সুশীতল সরোবর দর্শনে তৃপ্তি পায়; সেইরূপ মহাশয়ের আশা-বাক্যে আমার প্রাণের কোণে আবার আশার আলোক দেখা দিতেছে। কিন্তু যে ঈশ্বরের জগতপূর্ণ নাম, কোথায় সে ঈশ্বর? কোথায় সে দয়াময়? যিনি আমার মত পাপী তাপীকে দয়া করেন? আপনি লিখিয়াছেন, "কি কার্য্যে সংসারে আছি, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই। যিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা তিনিই জানেন।" অবশ্যই জানেন! তিনি সর্ব্বান্তর্যামী তিনি তো জানিবেনই; কিন্তু আমার কি হইল? আমার যে জ্বালা সেই জ্বালাই আছে, যে শূন্যতা সেই শূন্যতাই! আমার কি হইল? আমার সান্ত্বনার জন্য কি রাখিলেন? শেষ অবলম্বন একটী মধুময়ী কন্যা দিয়াছিলেন আমি তো তাহা চাহি নাই, তিনিই দিয়াছিলেন তবে কেন কাড়িয়া লইলেন? শুনেছিলাম দেবতার দান ফুরায় না! তার কি এই প্রমাণ? না অভাগিনীর ভাগ্য? হায়! ভাগ্যই যদি এত বলবান, তবে তিনি পতিতপাবন নাম ধরিয়াছেন কেন? দুর্ভাগ্য না হইলে কেন আকিঞ্চন করিব, কেন এত কাঁদিব! যে জন ভক্তি ও সাধনের অধিকারী সে তো

জোর করিয়া লয়! প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি আর আর সাধু ভক্তগণ তো জোর করিয়া লইয়াছেন। আমার মতন অধম, যদি চির-যাতনার বোঝা বহিয়া অনন্ত নরকে গেল, তবে তাঁহার পতিতপাবন নাম কোথায় রহিল?

আপনি লিখিয়াছেন—"তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইয়াছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয় স্থলে তোমার অদ্ভুত-শক্তি দ্বারা যেরূপ বহু নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার 'চৈতন্যলীলায়' চৈতন্য সাজিয়া বহু লোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যে সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে, সে সকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। যদিচ তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার দোষে নয় অবস্থায় পড়িয়া, এবং তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।"

মহাশয় বলিতেছেন—দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছি। দর্শক কি আমার অন্তর দেখিতে পাইতেন! কৃষ্ণ নাম করিবার সুবিধা পাইয়া কার্য্যকালে, অন্তরে বাহিরে কত

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতি অল্প বয়সেই আমার মাতাকে চিরদুঃখিনী করিয়া এ নারকীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার মৃত্যুতে আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরাণী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমার ভ্রাতা অসুস্থ হইলে অর্থের অভাবে তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে হয়। আমরা দুটী ক্ষুদ্র বালিকা বাটীতে থাকিতাম। আমাদের একটী দয়াবতী প্রতিবেশিনীর জন্য আমাদের আহারাদির কোন কষ্ট হইত না। তিনি আমাদের সঙ্গে করিয়া আমার মাতার ও মাতামহীর আহার লইয়া ডাক্তারখানায় আমার ভ্রাতাকে দেখিতে যাইতেন। কোন কোন দিন তাঁহাদের আহার করিবার জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে আমার ভ্রাতার নিকট বসিয়া থাকিতেন। পরে আমার মাতারা আহার সমাপন করিয়া সেইখানে যাইলে আমাদের সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিতেন, কেবল আমাদের বলিয়া নহে, তিনি স্বভাবতই পরোপকারিণী ছিলেন। যদি রাত্র দ্বি-প্রহরের সময় কেহ আসিয়া তাঁহাকে বিপদ জানাইত; তখনি অমনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে তাহাদের বাটী যাইতেন। পরে নিজের শরীর দ্বারাই হউক আর পয়সার দ্বারাই হউক লোকের উপকার সাধন করিতেন। তাঁহার মতন পরোপকারিণী এখনকার দিনে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার নিজের কিছু

সম্পত্তি ছিল, সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। পরোপকারই তাঁহার ব্রত ছিল।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়েই আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সে দিন আমার স্মৃতি-পটে জাজ্বল্যমান আছে। তখন ভাবিতে লাগিলাম, আবার আমার ভাই আসিবেনা কি? যমে নিলে যে আর ফিরাইয়া দেয়না, দৃঢ়রূপে তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আমার মাতামহী আমার ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন কিন্তু অতিশয় বৈরাগ্যশালিনীও ছিলেন। তাঁহার শুনা ছিল, ডাক্তারখানায় মরিলে মড়া কাটে, গতি করিতে দেয়না। যেমন আমার ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিল, তিনি অমনি সেই মৃতদেহ বুকে করিয়া তিন তলার উপর হইতে তড়্ তড়্ করিয়া নামিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে বেগে ছুটিলেন। আমরা আমার মাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী কেমন বিকৃত হৃদয় হইয়াছিলেন, তিনি হাঃ হাঃ করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতে লাগিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারখানার বড় ডাক্তার বলিতে লাগিলেন; "ব্যস্ত হইওনা, আমরা মড়া রাখিব না!" কিন্তু দিদিমাতা শুনেন নাই, তিনি একেবারে কোলে করিয়া লইয়া গঙ্গার তীরে মৃত দেহ শয়ান করাইয়া দেন। গঙ্গার উপর সেই ডাক্তারখানা। তখন একজন ডাক্তার সেইখান পর্য্যন্ত দয়া করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন,

যে "এখনই সংকার করিও না, অতিশয় বিষাক্ত ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, আমি আবার আসিতেছি।" পরে তাঁহারা ঘণ্টা খানেক সেই গঙ্গাতীরে সেই মৃতদেহ কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ডাক্তারবাবু আসিয়া আবার অনুমতি দিলে তবে কাশী মিত্রের ঘাটে এনে তাকে চিতায় শয়ন করান হয়। ইতিমধ্যে আমাদের সেই দয়াবতী প্রতিবেশিনী তথায় উপস্থিত হন। তিনি বাটী হইতে কিছু অর্থ আনিতে গিয়াছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা খারাপ দেখিয়া তার আগের রাত্রে আমি ও ভ্রাতৃবধূ সেইখানেই ছিলাম। এর ভিতর আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রক্ষা হয়। ভ্রাতার সংকারের জন্য আমার মাতামহী ও সেই প্রতিবেশিনী যখন ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় মা আমার আস্তে আস্তে গঙ্গার জলে কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। আমি মার কাপড় ধরিয়া খুব চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকায় আমার দিদিমাতা দৌড়াইয়া আসিয়া মাতাকে ধরিয়া লইয়া যান। ইহার পর মা আমার অনেক দিন অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। মোটে কাঁদিতেন না, বরং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেন। সে কারণ আমার দিদিমাতা বড়ই সাবধান ছিলেন। মায়ের সম্মুখে কাহাকেও আমার ভ্রাতার কথা কহিতে দিতেন না। যদিও আমার দিদিমাতা আমাদের সকলের অপেক্ষা আমার ভ্রাতাকেই অধিক স্নেহ করিতেন, কেন না

আমাদের বংশে পুত্র সন্তান কখন হয় নাই ; মেয়ের মেয়ে, তাহার মেয়ে নিয়েই সব ঘর। কিন্তু নিজ কন্যার অবস্থা দেখিয়া একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে আমরা সকলে শুইয়া আছি, আমার মা "ওরে বাবারে কোথা গেলিরে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার দিদিমাতা বলিলেন, "আঃ বাঁচলেম।" আমি 'মা মা' করিয়া উঠিতে দিদিমাতা বলিলেন, যে "চুপ—চুপ উহাকে কাঁদিতে দে," আমি ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমারও বড় কান্না আসিতে লাগিল।

শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথাও যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটী সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ আর আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটী আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর উহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি যে আমার একজন মাস্-শাশুড়ী ছিলেন; তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। লোক পরম্পরায় শুনিতাম যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন, এক্ষণে তিনিও আর সংসারে নাই। আমার ভ্রাতার জীবদ্দশায় আমার স্বামীকে আনিবার জন্য

কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। আমি একটী মাত্র কন্যা বলিয়া মাতামহীর ও মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমাদের বাটীতেই থাকেন। কেননা তিনিও আমাদের ন্যায় দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁহার মাসী আর আসিতে দেন নাই।

এই তো গেল আমার বালিকা কালের কথা; পরে যখন আমার নব বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিয়া বাস করেন। আমাদের বাটীতে একখানি পাকা একতলা ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যা সদৃশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা হইয়াছিলেন। তখনকার বালিকা-সুলভ-স্বভাব বশতঃ তাঁহার সহিত আমারই "গোলাপ ফুল" পাতান ছিল; আমরা উভয়ে উভয়কে "গোলাপ" বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনিও নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট কন্যা স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি সমভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। সময়ের গতিকে এবং অবস্থা ভেদে পরে যদিও আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইত, তথাপি সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে

সমভাবে ছিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়া ভুলিয়া যায় ও স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি"—ষ্টারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও অহঙ্কার শূন্যা ছিলেন। সেই উন্নত হৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গাগতা গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

আমাদের আর কোন উপায় না দেখিয়া আমার মাতামহী উক্ত বাইজীর নিকটেই আমায় গান শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তখন আমার বয়ঃক্রম ৭ বা ৮ বৎসর হইবে। আমার তখন গীত বাদ্য মত শিক্ষা করা হউক বা না হউক তাঁহার নিকট যে সকল বন্ধুবান্ধব আসিতেন, তাঁহাদের গল্প শুনা একটা বিশেষ কাজ ছিল। আর আমি একটু চালাক চতুর ছিলাম বলিয়া আমাকে সকলে আদর করিতেন। তখন বালিকা-সুলভ-চপলতা বশতঃ তাঁহাদের আদর আমার ভাল লাগিত। কি করিতাম, কি করিতেছি, ভাল কি মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু খুব বেশী মিশিতাম না; কেমন একটা লজ্জা বা ভয় হইত। দূরে দূরে থাকিতাম, কেননা আমি বাল্যকাল হইতে আমাদের বাটীর ভাড়াটিয়াদের

রকম লোকদের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিলাম, যাহারা আমাদের খোলার ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল ; তাহারা যদিও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় ঘর সংসার করিত ; দিন আনিত দিন খাইত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামারি করিত যে দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর তাহাদের কখনও বাক্যালাপ হইবে না। কিন্তু দেখিতাম যে পরক্ষণেই পুনরায় উঠিয়া আহারাদি হাস্য পরিহাস করিত। আমি যদিও তখন অতিশয় বালিকা ছিলাম, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতাম ! মনে হইত, আমি তো কখনও এরূপ দূষিত হইব না। তখন জানি নাই যে আমার ভাগ্যদেবতা আমার মাথার উপর কাল্ মেঘ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। তখন মনে করিতাম বুঝি এমনি মাতৃকোলে সরল সুখময় হৃদয় লইয়া চিরদিন কাটিয়া যাইবে। সেই মনোভাব লইয়া আমার বাল্যসখীর বন্ধুদের সহিত বাহিরে বাহিরে আনন্দ করিয়া খেলা করিয়া, রাত্রি হইলে স্নেহময়ী জননীর কোলে শুইয়া আনন্দ লাভ করিতাম। আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, গঙ্গামণির ঘরে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠ বলিয়া দুইটী ভদ্রলোক তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রায়ই আসিতেন ; শুনিতাম তাঁহারা নাকি কোনখানে "সীতার বিবাহ" নামে গীতিনাট্য অভিনয় করিবার মানস করিয়া

ছিলেন। তিনি একদিন আমার মাতামহীকে ডাকিয়া বলিলেন যে "তোমাদেরও বড় কষ্ট দেখিতেছি তা তোমার এই নাতনীটিকে থিয়েটারে দিবে? এক্ষণে জলপানি-স্বরূপ কিছু কিছু পাইবে, তারপর কার্য্য শিক্ষা করিলে অধিক বেতন হইতে পারিবে।" তখন সবে মাত্র দুইটী থিয়েটার ছিল, একটী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" দ্বিতীয় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বেঙ্গল থিয়েটার"। আমার দিদিমাতা দুই চারিটী লোকের সহিত পরামর্শ করিলেন, অবশেষে পূর্ণবাবুর মতে থিয়েটারে দেওয়াই স্থির হইল। তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত "ন্যাশন্যাল থিয়েটারে" দশ টাকা মাহিনাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গঙ্গাবাইজী যদিও একজন সুগায়িকা ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়া কিছুমাত্র জানিতেন না; সেইজন্য আমার থিয়েটারে প্রবেশের কতদিন পরে তিনি সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়া আসরে প্রবৃত্ত হন, পরে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত থিয়েটারের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

এই সময় হইতে আমার নূতন জীবন গঠিত হইতে লাগিল। সেই বালিকা বয়সে, সেই সকল বিলাস বিভূষিত লোক সমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য্য, সকলই আমার নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম,

আকুল প্রাণে ডাকিয়াছিলাম ! দর্শক কি তাহা দেখিয়াছেন ? তবে কেন একমাত্র আশার প্রদীপ নিবিয়া গেল ? আর অনুতাপ ! সমস্ত জীবনই তো অনুতাপে গেল। পদে পদে তো অনুতপ্ত হইয়াছি, জীবন যদি সংশোধন করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে অনুতাপের ফল হইত বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু অনুতাপের কি ফল ফলিয়াছে ? এখনও তো স্রোতে মগ্ন তৃণ প্রায় ভাসিয়া যাইতেছি। তবে আপনি কাহাকে অনুতাপ বলেন জানি না। এই যে হৃদয় জোড়া যাতনার বোঝা লইয়া তাঁর বিশ্বব্যাপী দরজায় পড়িয়া আছি, কেন দয়া পাইনা। আর ভাবিব না, আর কাঁদিব না বলেও যে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" করিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণ হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছি, কোথায় সে হরি ?

বাল্যকাল হইতে কত সাধ, কত বাসনা, কত সরল সৎপ্রবৃত্তি কালের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব ? কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া, জগৎ-সুন্দর জগদীশ্বরের দিকে যে বাসনা সৎপথে ছুটিতে চাহিত, তখন মোহজালে জড়িত মন তাহাকে চোরাবালির মোহে ডুবাইয়া দিয়াছে। যখন জোর করিয়া উঠিতে আগ্রহ হইত, কিন্তু চোরা-বালিতে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়া, জোর করিয়া উঠিতে গেলে যেমন বালির বোঝা সব চারিদিক হইতে আরও উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পাতালে ডুবাইয়া দেয়, আমার

দুর্ব্বল বাসনাকেও তেমনি মোহ-ঘোর আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। বলহীন বাসনা আশ্রয় পায় নাই, ডুবিয়া গিয়াছে! চোরাবালিতে পড়িয়া পুঁতে যাওয়ার ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডুবিয়াছে! কিন্তু এখন তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি যে বাসনা প্রবৃত্তি উপরে ছুটিতে চায়। কে যেন ঘাড় ধরিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহাতো বুঝিতে পারিনা। তখন কত কাতরে কাঁদি, তবু ডুবি! শক্তিহীন দুর্ব্বল বলিয়াই ডুবি। বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়; মহাশয় মনের আবেগে কত কথা আসিয়া পড়িতেছে। যাহার দিকে চাহিয়া, যাহাকে বড় আপনার করিয়া, বড়ই অনাথ হইয়া চরণ ধরিয়া আপনার করিতে যাই, তবু দূরে বহু দূরে পড়িয়া থাকি; অধিক বলিয়া বিরক্ত করিব না, এক্ষণে বিদায় হই!

অভাগিনী!

৩য় পত্র।

মহাশয়!

পূর্ব্বের অবস্থা যাহাই থাকুক, উপস্থিত অবস্থায় কি কার্য্যে আছি! রুগ্ন, অথর্ব্ব, ভবিষ্যৎ আশা শূন্য, দিন যামিনী এক ভাবেই যাইতেছে, কোনরূপ উৎসাহ নাই। রোগ-শোকের তীব্র কশাঘাত, নিরুৎসাহের জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া অপরিবর্ত্তিত স্রোত চলিতেছে। আহার,

নিদ্রা ও দুশ্চিন্তা, প্রতিদিনের ছবি একদিনে পাওয়া যায়, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ কোনই পরিবর্ত্তন নাই ! কেবলমাত্র প্রভেদ এই কখন কখন রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি সদা সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তি ! কেহ যত্ন করিয়া উপশমের চেষ্টা করিলে, সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইতে বলিলে মনে মনে হাসি পায় ! কারণ তাঁহারা এই বলিয়া আশ্বাস দেন, বলেন "সুস্থ হইয়া থাক কোনরূপ চিন্তা করিওনা ।" আমি ভাবি তাঁহারা আমার অবস্থা বোঝেন না । তাঁহারা বোঝেন না যে যদি চেষ্টা করিয়া সুস্থ থাকা সম্ভব হইত ; সে চেষ্টা শত সহস্ররূপে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বলার অপেক্ষা থাকিত না । ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা আমার মতন ভাগ্যহীনা লোকের স্বরূপ অবস্থা না বোঝেন । কারণ এরূপ অবস্থায় না ঠেকিয়া কেহ বুঝিতে পারে না ! সততই মনে হয় যে এই আশাশূন্য দুশ্চিন্তায় সদাসর্ব্বদা মগ্ন থাকাই কি ঈশ্বরের কার্য্য ? সর্ব্বদাই বলি ভগবান আর কতকাল ! দুঃখের অবসান না হউক অন্ততঃ স্মৃতির জ্বলন্ত যাতনা হইতে নিস্তার পাইয়া শান্তিলাভ করি । সে যন্ত্রণা অতি তীব্র । বিনীত ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এইরূপ জরাজীর্ণ দেহ লইয়া অবসন্ন ভাবে সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া কি আপনার মতে ঈশ্বরের কার্য্য হইতেছে ?

৪র্থ পত্র।

মহাশয়!

আপনাকে যখন দুঃখের কথা জানাইয়া পত্র লিখি, পত্রের উত্তরে—আপনার সান্ত্বনা বাক্যে আশার ক্ষীণ আলোক হৃদয়ে দেখা দেয়! কিন্তু সে ক্ষণিক—মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়। আপনি তো জানেন আমার তমোময় হৃদয়ের আলোক স্বরূপ একটী কন্যা অযাচিত রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে কন্যাটী নাই। এক্ষণে আমার গাঢ় তমাচ্ছন্ন হৃদয় গাঢ়তর তিমিরে ডুবিয়াছে। যত প্রকারে সান্ত্বনা আনিবার চেষ্টা পাই, সকলেই বিফল। "ঈশ্বর দয়া কর" "হরি দয়া কর"— বারবার বলি সত্য, কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখিতে পাই যে আমার সেই প্রাণ-প্রতিমার জন্য আমি লালায়িত। যেমন দিক্ নির্ণয় যন্ত্রের সূচিকা উত্তরাভিমুখে থাকে, আমারও মন সেইরূপ সেই হারানিধিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। যিনি আমার বেদনা জানেন না, তিনি আমার বেদনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কন্যার জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনা আমার মানস দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। এ অবস্থায় শান্তি কোথায়? সততই মনে হয়, আমি কি এই দারুণ যন্ত্রণা ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি! আপনার নীতিগর্ভ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে হয়তো বা শান্তিলাভ

করিতে পারিতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস আমার কোথায় ? বাল্যকাল হইতে সংসারচক্রে পড়িয়া অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, এই অবিশ্বাসের জন্য আমার অভিভাবক, সাংসারিক অবস্থা ও আমি নিজে দায়ী ! কিন্তু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ফল কি ? অবিশ্বাস অবিশ্বাসই আছে। অবস্থায় পড়িয়া যে দিকে মনের গতি, তাহার বিপরীত দিকে চিরদিনই চালিত হইয়াছি। এই বিপরীত যুদ্ধে শরীর-মন জর্জ্জরীভূত। বলিয়াছি আমার হৃদয় সেই স্নেহ-প্রতিমার দিকে দিবারাত্রে রহিয়াছে। তাহার আলোচনা দুঃখময়, কিন্তু সেই আলোচনাই আমার সুখ ! হতাশ্বাসপূর্ণ সন্তান-হারা হৃদয়ে আর অপর সুখ নাই। অবিশ্বাসের মূল কিরূপ দৃঢ় হইয়া অন্তরে বসিয়াছে, তাহা আমার জীবনের ঘটনাবলি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। আপনি বলেন, আমার আজীবন বৃত্তান্ত শুনিলে, আমি যে ঈশ্বরের কার্য্যে সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। আমিও আমার আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি বিবৃত করিব। যদি কৃপা করিয়া শুনেন, বুঝিতে পারিবেন অবিশ্বাস কিরূপে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এবং তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব ! শান্তির মূল বিশ্বাস, হয়তো বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই বিশ্বাস কোথায় ? আমার প্রতি আপনার অশেষ স্নেহ, এই নিমিত্ত সাহস করিয়া আদ্যোপান্ত বলিতেছি। কৃপা করিয়া শুনুন ! শুনিতে শুনিতে

যদি বিরক্তি জন্মায় পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। শুনিবেন কি?

মহাশয় আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনী শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়। আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি দয়া করিয়া শুনিলে কৃতার্থ হইব এবং আপনার ন্যায় মহৎ লোকের নিকট হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া এ দুর্ব্বিসহ হৃদয়ভার কতকটা লাঘব করিব।

১ম কথা (পল্লব) রঙ্গালয়ে প্রবেশের সূচনা।

(বাল্য-জীবন)

আমার জন্ম এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে সহায় সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না, কেননা কষ্টে-শ্রেষ্টে এক রকম দিন গুজরান হইত। তবে বড় সুশৃঙ্খলা ছিল না, অভাব যথেষ্টই ছিল। আমার মাতামহীর একখানি নিজ বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘর অনেক-গুলি ছিল। সেই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৪৫ নম্বর বাটী এখন আমার অধিকারে আছে। সেই সকল খোলার ঘরে কতকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিরা বাস করিত। সেই আয় উপলক্ষ করিয়াই আমাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত। আর তখন দ্রব্যাদি সকল সুলভ ছিল; আমরাও অল্প পরিবার। আমার মাতামহী, মাতা আর আমরা দুটী ভ্রাতা ভগ্নী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সহিত আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তখন আমার মাতামহী একটী মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চম-

বর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল। কারণ ইহার অগ্রেই মাতামহীর ও মাতাঠাকুরাণীর যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরাণী বড়ই স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণকারের দোকানে এক একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া আমাদের হাতে দিতেন, অলঙ্কার বিক্রয় জন্য কখন দুঃখ করিতেন না।

আমার সেই সময়ের একটী কথা মনে পড়ে: আমার যখন বয়স বছর সাতেক তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম্ম বাড়ী গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটী সন্দেশ চাহিয়া আনিয়াছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশপনের দিন তুলিয়া রাখিয়া, গায় কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন; এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত! আমার মাতা তাহা বাটীতে আনিয়া আমাদের তিনজনকে আনন্দের সহিত খাইতে দেন। পাছে সেই দুর্গন্ধ সংযুক্ত সন্দেশ শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এইজন্য অতি অল্প করিয়া খাইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা [illegible]য়াছিল। এই আমার সুখের বাল্য কালের ছবি।

প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। সাংসারিক কষ্ট মনে করিয়া আরও আগ্রহ হইত। মাতার শোক দুঃখ-পূর্ণ মুখখানি মনে করিয়া আরও উৎসাহ বাড়িত। ভাবিতাম যে মায়ের এই দুঃখের সময় যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে সাংসারিক কষ্টও লাঘব হইবে।

যদিও রঙ্গালয়ে শিক্ষামত কার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু আমার মনের ভিতর কেমন একটা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা সতত ঘুরিয়া বেড়াইত। মনে ভাবিতাম, যে আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব! আমার মন সকল সময়েই সেই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন সবে মাত্র চারিজন অভিনেত্রী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ছিলেন। রাজা, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী ও নারায়ণী। ক্ষেত্রমণি আর ইহ-লোকে নাই। সে একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিল। তাহার অভিনয় কার্য্য এত স্বাভাবিক ছিল যে লোকে আশঙ্কা হইত, তাহার স্থান আর কখন পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ! "বিবাহ-বিভ্রাটে" ঝীর অংশ অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং "ছোট লাট টমসন" বলিয়াছিলেন যে এ রকম অভিনেত্রী আমাদের বিলাতেও অভাব আছে। চৌরঙ্গীর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এক সময় অনেক বড় বড় সাহেব ও বাঙ্গালীর অধিবেশন হইয়াছিল, সেইখানেই আমাদের থিয়েটারে বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় হয়, তাহার অভিনয় ছোট লাট

সাহেব দেখিয়া ছিলেন। যাহা হউক, মহাশয় অধিক আর বলিতে সাহস হইতেছে না। যেহেতু সেই গতজীবনের নীরস ও বাজে কথা শুনিতে হয় তো আপনার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সেইজন্য এইখানে বন্ধ করিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমি অতি অল্প সময় মধ্যেই তাঁহাদের ন্যায় সমান অংশ অভিনয় করিতে পারিতাম।

দ্বিতীয় পল্লব।

রঙ্গালয়ে।

মহাশয় !

আপনার যে এখনও আমার জীবনের দুঃখময় কাহিনী শুনিতে ধৈর্য্য আছে, ইহা কেবল আমার উপর মহাশয়ের অপরিমিত স্নেহের পরিচয়।

আপনি ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন যে, প্রতি চরিত্র অভিনয়ে আমি মানুষের মনে দেবভাব অঙ্কিত করিয়াছি। দর্শক অভিনয় দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন ও মনঃসংযোগে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে দেব-ছবি অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অবকাশ হয় তবে বুঝাইয়া দিবেন। এক্ষণে যদি ধৈর্য্য থাকে তবে আমার নাট্কীয় জীবন শুনুন!

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। সে স্থান যদিও আমার

বিশেষ স্মরণ নাই, তবুও অল্প অল্প মনে পড়ে। বড়ই রমণীয় স্থান ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ী ও বারান্দা, নীচে গঙ্গার বড় বাঁধান ঘাট; দুইধারে অতিথ-পথ-যাত্রীদিগের বিশ্রাম-ঘর। সেই বালিকা কালের সেই রমণীয় ছবি দূর স্মৃতির ন্যায় এখনও আমার মনোমধ্যে জাগিয়া আছে, কেমন গঙ্গা কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইত। আমি সেই টানা বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার মনে কত আনন্দ, কত সুখ-স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিত। বালিকা বলিয়াই হউক, কিম্বা শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়াই হউক, সকলে আমাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। আমরা যে তখন বড় গরীব ছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ঐ নিজের একটী বনাত বাটি ছাড়া ভাল কাপড় জামা বা অন্য জেবরাদি কিছুই ছিল না। সেই সময়ে "রাজা" বলিয়া যে প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন, তিনি আমায় ছোট হাত-কাটা দুটী ছিটের জামা তৈয়ারী করাইয়া দেন। তাহা পাইয়া আমার কত যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই জামা দুইটিই আমার শীতের সম্বল ছিল। সকলে বলিত যে এই মেয়েটীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে বোধ হয় খুব কাজের লোক হইবে। তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺ অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন।

শরৎ-সরোজিনী নাটকে "সরোজিনী" (পুরুষবেশে)র ভূমিকায়

শ্রীমতী বিনোদিনী।

Lakshmi Printing Works.

আর বোধহয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়েনা। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত নাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় "বেণী-সংহার" পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বইএর ড্রেস-রিহার্সাল হয়, সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেননা—রিহার্সাল বাড়ীতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোকও থাকিত।

কিন্তু যে দিন পার্ট লইয়া জন সাধারণের সম্মুখে ষ্টেজে বাহির হইতে হইল, সে দিনের হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব। সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, পাদুটীও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই

সকল উজ্জ্বল দৃশ্য যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভিতর হইতে অধ্যক্ষেরা আমায় আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ভয়, ভাবনা ও মনের চঞ্চলতার সহিত কেমন একটা কিসের আগ্রহও যেন মনের মধ্যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহা কেমন করিয়া বলিব? একে আমি অতিশয় বালিকা, তাহাতে গরীবের কন্যা, কখনও এরূপ সমারোহ স্থানে যাইতে বা কার্য্য করিতে পাই নাই। বাল্যকালে কতবার মাতার মুখে শুনিতাম ভয় পাইলে হরিকে ডাকিও, আমিও ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, যে কয়টী কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুচারুরূপে ও সেইরূপ ভাবভঙ্গীর সহিত বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। ভয়েই হউক, আর উত্তেজনাতেই হউক, আমার তখনও পা কাঁপিতেছিল। ভিতরে আসিতে অধ্যক্ষেরা কত আদর করিলেন। কিন্তু তখন করতালির কি মর্ম্ম তাহা জানিতাম না। পরে সকলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে আনন্দে করতালি দিয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পরেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের "হেমলতা" নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমার পার্ট শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া সকলে বলিত্ত

যে এই মেয়েটী হেমলতার পার্ট ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে। এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেই সঙ্গে মদনমোহন বর্ম্মণ অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। বহুদিন যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাদম্বিনী অভিনয় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অবসর প্রাপ্তা। এই "হেমলতা" অভিনয় শিক্ষা দিবার সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি যখন কার্য্য স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতাম, সেই সকল কার্য্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাব ভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারি-দিকে ঘেরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করি-তাম তখনও যেন একটা অব্যক্তশক্তি দ্বারা সেইদিকেই আকৃষ্ট থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুর ভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথমবারের মত ভয় হইল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।

সে দিন আমি রাজকন্যার অভিনয় করিব কিনা—তকতকে ঝকঝকে উজ্জ্বল পোষাক দেখিয়া ভারি আমোদ হইল। তেমন পোষাক পরা দূরে থাক্, কখন চক্ষেও দেখি নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরের দয়াতে আমি "হেমলতা"র পার্ট সুচারুরূপে অভিনয় করিলাম। তখন হইতে লোকে বলিত যে "ইহার উপর ঈশ্বরের দয়া আছে।" আর আমারও এখন বেশ মনে হয়, যে আমার ন্যায় এমন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বালিকা ঈশ্বর অনুগ্রহ ব্যতীত কেমন করিয়া সেরূপ দুরূহ কার্য্য সমাপন করিয়াছিল। কেননা আমার কোন গুণ ছিল না, তখন ভাল লেখাপড়াও জানিতাম না, গান ভাল জানিতাম না। তবে শিখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল।

সেই সময় হইতে আমি প্রায় প্রধান প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্ত্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের বয়সে সমান না হইলেও অল্পদিনে কাজে তাঁহাদের সমান হইয়া ছিলাম। ইহার কয়েক মাস পরেই "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার কোম্পানী পশ্চিম অঞ্চলে থিয়েটার করিতে বাহির হন, এবং আমায় আর পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করেন। পশ্চিমে থিয়েটার করিবার সময় দু'একটী ঘটনা শুনুন,—

যদিও সে ঘটনা শুধু আমার সম্বন্ধে নয় তবুও তাহা কৌতূহলকর।

একরাত্রি লক্ষ্ণৌনগরে ছত্রমণ্ডিতে আমাদের "নীলদর্পণ" অভিনয় হইতেছিল, সেই দিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ছিলেন। যে স্থানে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া রোগ সাহেবকে মারে, সেই সময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একে তো "নীলদর্পণ" পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল; তাহাতে বাবু মতিলাল সুর—তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয়—মিষ্টার রোগ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একবারে ষ্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত। এইরূপ কারণে আমাদের কান্না, অধ্যক্ষদিগের ভয়, আর ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের কাঁপুনি!! তারপর অভিনয় বন্ধ করিয়া, পোষাক আসবাব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া বাসায় এক রকম পলায়ন!! পরদিন প্রাতেই লক্ষ্ণৌনগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়ন!!

ইহার পরে আমরা যদিও অনেক স্থানে গিয়াছিলাম কিন্তু সব কথা আমার মনে নাই, তবে দিল্লীতে মাছির ঘর, বিছানা

ব্যতীত কিছুই দেখা যাইত না। এবং সেই প্রথম ভিস্তির জলে স্নান করিতে আমার আপত্তি, মাতার ক্রমাগত রোদন দেখিয়া, আমার মাকে একটী ইঁদারার জল নিজ হাতে তুলিয়া স্নান আহার করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমাদের ভিস্তির জলই বন্দোবস্ত। দিল্লীতে আর একটা ঘটনা হয় তাহা ক্ষুদ্র হইলেও আমার বেশ মনে আছে। দিল্লীর বাড়ীর খোলা ছাদে আমি একদিন ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতে ছিলাম। কি কারণে মনে নাই, কাদম্বিনীর তাহা অসহ্য হওয়ায় আমার হাত ধরিয়া আমার গালে দুই চড় মারেন, সেই দিন আমরা মায়ে ঝীয়ে সারাদিন কাঁদিয়া ছিলাম। মা আমার মনের দুঃখে কিছু খান নাই, আমিও মায়ের কাছে সমস্ত দিন বসিয়া ছিলাম, শেষে বৈকালে থিয়েটারের বাবুরা আমায় জোর করাইয়া আহার করান। আমার মা কিন্তু সে দিন কিছুই আহার করিলেন না। একে তো দিল্লীসহরে মুসলমানের বাড়াবাড়ি দেখিয়া মা আমার ক্রমাগতই কাঁদিতেন, কি করিবেন, একে আমরা গরীব তাহাতে আমি বালিকা, যদিও কর্তৃপক্ষেরা যত্ন করিতেন, তবুও বড় অভিনেত্রীরা নিজের গণ্ডা নিজে বুঝিয়া লইতেন, আমার দয়ার উপর নির্ভর ছিল। আর কি কারণে—জানিনা, সকলের অপেক্ষা কাদম্বিনী যেন কিছু অহঙ্কৃতা ছিলেন, আমার উপর কেমন তাঁর দ্বেষ

ছিল, প্রায়ই দূর ছাই করিতেন। তারপর বোধ হয় আমাদের লাহোরে যাইতে হয়। লাহোরে আমাদের বেশী দিন থাকিতে হয়; সেখানে অনেকগুলি বই অভিনয় হইয়া ছিল। আমি নানা রকম পার্ট অভিনয় করিয়া ছিলাম। "সতী কি কলঙ্কিনী"তে রাধিকা, "নবীন তপস্বিনী"তে কামিনী, "সধবার একাদশী"তে কাঞ্চন, "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে কচি—কত বলিব। তবে বলিয়া রাখি যে, সে সময় আমার এত অল্প বয়স ছিল যে বেশ করিবার সময় বেশকারীদের বড় সঙ্কটে পড়িতে হইত। আমার মত একটী বালিকাকে কিশোর বয়স্কা বা সময় সময় প্রায় যুবতীর বেশে সজ্জিত করিতে তাহারা সময়ে সময়ে বিরক্ত হইত—তাহা বুঝিতাম। আবার কখন কখন সকালে তামাসা করিয়া বলিত "যে তোকে কামার দোকানে পাঠাইয়া দিয়া পিটিয়া একটু বড় করিয়া আনাইব।" লাহোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপ সিংহ বলিয়া একজন বড় জমীদার মহাশয়ের খেয়াল উঠিল, যে তিনি আমায় বিবাহ করিবেন এবং যত টাকা লইয়া আমার মাতা সন্তুষ্ট হন তাহা দিবেন। পূর্ব্বোক্ত জমীদার মহাশয় অর্দ্ধেন্দুবাবু ও ধর্ম্মদাস বাবুকে বড়ই পিড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তখন উঁহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি নাকি সেখানকার একটী বিশেষ বড় লোক। একে বিদেশ—উপরান্ত এই

সকল কথা শুনিয়া আমার মা তো কাঁদিয়াই আকুল। আমিও ভয়ে একবারে কাঁটা। এই উপলক্ষে আমাদের শীঘ্রই লাহোর ছাড়িতে হয়। ফিরিবার সময় আমরা ৺ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম দিয়া আসিয়া ছিলাম। ৺ শ্রীবৃন্দাবন ধামে আবার আমি একটী বিশেষ ছেলে মানুষি করিয়া ছিলাম। তাহা এই :—

থিয়েটার কোম্পানী সেই দিন ৺ শ্রীধামে পৌঁছিয়া চল্লিশ জন লোকের জলখাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাঁহারা ৺ শ্রীশ্রীঠাকুরদিগের দর্শন করিতে গেলেন এবং আমাকে বলিয়া যান যে "তুমি ছেলে মানুষ, এখনই এই গাড়ীতে আসিলে, এখন জল খাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাক। আমরা দেবতা দর্শন করিয়া আসি।" আমি বাসায় দরজা বন্ধ করিয়া রহিলাম। তাঁহারা সকলে ৺ শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন জন্য চলিয়া গেলেন। আমার একটু রাগ ও দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কি করিব? মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া রহিলাম। ঘরের দরজা দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় একটা বাঁদর আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। আমি বালিকা-সুলভ-চপলতা বশতঃ তাহাকে একটী কাঁকড়ি খাইতে দিলাম, সে খাইতেছে এমন সময় আর দুইটা আসিল, আমি তাহাদেরও কিছু খাবার দিলাম, আবার গোটা দুই আসিল, আমি মনে ভাবিলাম যে ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চার পাঁচটী জানালা ছিল, আমি যত আহার দিই, ততই

জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার বড় ভয় হইল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল প্রায় তার সকলই তাহাদের দিতে লাগিলাম। আর মনে করিতে লাগিলাম যে এইবারেই তারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল, বানরের দল তত বাড়িতে লাগিল। আর আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাদের ক্রমাগত আহার দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কোম্পানীর লোক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বানরে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা লাঠি ইত্যাদি লইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া আমায় দরজা খুলিতে বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল কথা তাঁহাদের বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আমার মা আমায় দুটী চড় মারিলেন ও কত বকিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি যে অত ক্ষতি করিয়া ছিলাম, তবু কোম্পানীর সকলে আমায় মারিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন যে "মারিও না, ছেলে মানুষ ও কি জানে? আমাদের দোষ, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই হইত!" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন "বোকা মেয়ে আমাদের সকল খাবার বিলাইয়া ব্রজবাসীদিগের ভোজন করাইলি, এখন আমরা কি খাই বল দেখি?" আবার জলখাবার খরিদ করিয়া আনা হইল, তবে তাঁহারা জল খাইলেন। ঐ কথা লইয়া

নীলমাধববাবু আমায় দেখা হইলেই এখনও তামাসা করিয়া বলিতেন, যে "৶ বৃন্দাবনে গিয়া বাঁদর ভোজন করাবি বিনোদ!" নীলমাধব চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় নাট্যজগতে বিশেষ সুপরিচিত। সকলেই তাঁহার নাম জানেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে পশ্চিমে ছিলেন, তিনি আমায় অতিশয় যত্ন করিতেন। দিল্লীতে যখন সব একট্রেসরা চাদর, জামা, কাপড় নিজ নিজ পয়সায় খরিদ করেন। আমার পয়সা ছিল না বলিয়া কিনিতে না পারায় তিনি আমায় একখানি ফুল দেওয়া চাদর ও কাপড় কিনিয়া দেন। সেই তখনকার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার স্নেহের জিনিষ আমার কতদিন ছিল। আর একটী প্রথম উপহার, একটী অকৃত্রিম স্নেহময় বন্ধুর প্রদত্ত আমার বড় আদরের হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর ডাক্তার মহাশয় তিনি একটী চাঁপার গড়ন রূপার ফুল ও খেলিবার একটী কাঠের ফুলের খেলনা আমায় দিয়া ছিলেন। তাঁহার সেই স্নেহময় উপহার আমার সেই বালিকাকালে বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। নিঃস্বার্থ স্নেহে বশীভূত হইয়া আমি এখনও তাঁর দয়া অনুগ্রহ দ্বারা ও দায় বিদায়ে রোগে শোকে সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। তাঁহার অকৃত্রিম অনুগ্রহে আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী। এই বহু সম্মানিত ডাক্তার বাবু মহাশয় এই অভাগিনীর চির ভক্তির পাত্র! এইরূপেই আমার বাল্যকালের নাট্যজীবন!

ইহার পর আমরা কলিকাতা চলিয়া আসি। তারপর বোধহয় পাঁচ ছয় মাস পরে "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আমি মাননীয় ৺ শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। তখনও যদিচ আমি বালিকা কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কার্য্যতৎপরা এবং চালাক চটপটে হইয়া ছিলাম। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। এইখান হইতেই আমার অভিনয় কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান। সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাননীয় স্বর্গগত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অতুলনীয় স্নেহ মমতা। তিনি আমায় এত অধিক যত্ন করিতেন, বোধহয় নিজকন্যা থাকিলেও এর অধিক স্নেহ পাইত না।

মহাশয়ের আমার উপর অসীম করুণা ছিল, সেই কারণে বলিতে সাহস করিতেছি। যদি অনুমতি করেন তবে বেঙ্গল থিএটারে যে কয়েক বৎসর অভিনয় কার্য্য করিয়া ছিলাম, সেই সময়ের ঘটনাগুলি বিবৃত করি।
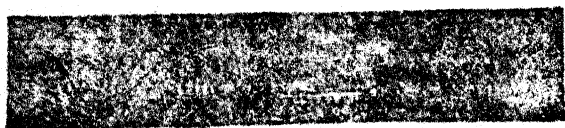
বেঙ্গল থিয়েটারে।

কৈশোরে পদার্পণ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ পূজনীয় ৺ শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হই। ঠিক মনে পড়েনা, কি কারণ বশতঃ আমি "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার ত্যাগ করি। এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের উন্নতির মূল; এই স্থানে ৺ শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূমিকা অভিনয় করিতে আরম্ভ করি। মাননীয় শরৎবাবু আমায় কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার অসীম স্নেহ ও গুণের কথা আমি একমুখে বলিতে পারিনা। প্রসিদ্ধা গায়িকা বনবিহারিণী (ভুনি), সুকুমারী দত্ত (গোলাপী) ও এলোকেশী সেই সময় "বেঙ্গলে" অভিনেত্রী ছিলেন। তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়ার্থে প্রস্তুত হইতেছিল। আমি উক্ত "মেঘনাদ বধ" কাব্যে সাতটী পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলাম। ১ম চিত্রাঙ্গদা, ২য় প্রমিলা, ৩য় বারুণী, ৪র্থ রতি, ৫ম মায়া, ৬ষ্ঠ মহামায়া, ৭ম সীতা। বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনীতে"

মনোরমা অভিনয়ই করিতাম এবং "দুর্গেশনন্দিনীতে" আয়েষা ও তিলোত্তমা এই দুইটী ভূমিকা প্রয়োজন হইলে দুইটাই একরাত্রি একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছি। কারাগারের ভিতর ব্যতীত আয়েষা ও তিলোত্তমার দেখা নাই। কারাগারে তিলোত্তমার কথাও ছিলনা, অন্য একজন তিলোত্তমার কাপড় পরিয়া কারাগারে গিয়া "কেও—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা ?" জগৎসিংহের মুখে এইমাত্র কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত।" আর সেই সময়েই আয়েষার ভূমিকার শ্রেষ্ঠ অংশ ওসমানের সহিত অভিনয়! এই অতি সঙ্কুচিতা ভীরু স্বভাবা রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনি আবার উন্নত-হৃদয়া-গর্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাব পুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুই ভাগে নিজেকে বিভক্ত করিতে কত যে উত্তম প্রয়োজন তাহা বলিবার নহে। ইহা যে প্রত্যহ ঘটিত তাহা নহে, কার্য্যকালীন আকস্মিক অভাবে এইরূপে কয়েকবার অভিনয় করিতে হইয়া ছিল।

একদিন অভিনয় রাত্রিতে আয়েষা সাজিবার জন্য গৃহ হইতে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া অভিনয় স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যিনি "আসমানির" ভূমিকা অভিনয় করিবেন তিনি উপস্থিত নাই। রঙ্গালয় জনপূর্ণ! কর্তৃপক্ষগণের ভিতর চুপি চুপি কথা হইতেছে—"কে বিনোদকে 'আসমানির' পার্ট অভিনয় করিতে বলিবে ? উপস্থিত বিনোদ ব্যতীত অন্য কেহই পারিবে না।" আমি

বাটী হইতে একবারে আয়েষার পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই বলিতেছেন না। এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু আসিয়া অতি আদর করিয়া বলিলেন, "বিনোদ! লক্ষ্মী ভগ্নিটী আমার! আসমানি যে সাজিবে তাহার অসুখ করিয়াছে, তোমায় আজ চালাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি"। যদিও মুখে অনেকবার "না—পারিব না" বলিয়াছিলাম বটে, আর বাস্তবিক সেই নবাব পুত্রীর সাজ ছাড়িয়া তখন দাসীর পোষাক পরিতে হইবে, আবার "আয়েষা" সাজিতে অনেক খুঁত হইবে বলিয়া মনে মনে বড় রাগও হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করিবার সময় "ইংলিসম্যান", "ষ্টেটস্ম্যান" ইত্যাদি কাগজে আমায় কেহ "সাইনোরা", কেহ কেহ বা "ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ ষ্টেজ" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এখনও আমার পূর্ব্ব বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা বলেন, যে "সাইনোরা" ভাল আছ তো!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই থিয়েটারে বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনী" অভিনীত হইত। তাহার অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখনকার বা এখনকার কোন রঙ্গালয়ে এ পুস্তকের এরূপ অভিনয় বোধহয় কোথাও হয় নাই। এই মৃণালিনীতে হরি বৈষ্ণব—হেমচন্দ্র, কিরণ বাড়ুয্যে—

পশুপতি, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত)—গিরিজায়া, ভুনী—মৃণালিনী এবং আমি—মনোরমা।

আর গোটাকয়েক কথা বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটার সম্বন্ধে কথা শেষ করিব। একবার আমরা সদলবলে চুয়াডাঙ্গা যাই, আমাদের জন্য একখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি! মাস—স্মরণ নাই, মাঝখানে কোন্ ষ্টেশনে তাও মনে নাই, তবে সে যে একটী বড় ষ্টেশন সন্দেহ নাই। সেইস্থানে নামিয়া "উমিচাঁদ" বলিয়া ছোটবাবু মহাশয়ের একজন আত্মীয় (আমরা মাননীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ছোটবাবু বলিয়া ডাকিতাম) ও আর দুই চারিজন একত্রে আমাদের কোম্পানীর জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার, পাতা ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন, উমিচাঁদ বাবুর আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ছোটবাবু মহাশয় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া "ওহে উমিচাঁদ শীঘ্র এস—শীঘ্র এস—গাড়ী যে ছাড়িল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় গাড়ীও একটু একটু চলিতে লাগিল, ইতাবসরে দৌড়িয়া উমিচাঁদবাবু গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ীও জোরে চলিল। এমন সময় উমিচাঁদ বাবু অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছোটবাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে "সর্দ্দিগরমি হইয়াছে, জল দাও জল দাও" করিতে লাগিলেন; চারুচন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া

বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে সমস্ত গাড়ীখানার ভিতর একটা লোকের কাছে, এমন কি এক গণ্ডূষ জল ছিল না, যে সেই আসন্ন-মৃত্যুমুখে পতিত লোকটার তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। "ভুনি" তখন সবে মাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কোলে ছোট মেয়ে; সে সময় অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আপনার স্তন্য দুগ্ধ একটী ঝিনুকে করিয়া লইয়া উমিচাঁদের মুখে দিল। কিন্তু তাহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। বোধহয় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। গাড়ী শুদ্ধ লোক একবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ছোটবাবু মহাশয় উমিচাঁদের বুকে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি একে বালিকা, তাহাতে ওরকম মৃত্যু কখন দেখি নাই, ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম। উমিচাঁদবাবুর মৃত্যুকালীন সেই মুখভঙ্গী আমার মনোক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। আমার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু মহাশয় ছোটবাবুকে বলিলেন, "শরৎ থাম, যাহা হইবার হইয়াছে; এখন যদি রেলের লোক এ ঘটনা জানিতে পারে, গাড়ী কাটিয়া দিবে, এত লোকজন লইয়া রাস্তার মাঝে আর এক বিপদ হইবে।" ছোটবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি উমির মা'কে গিয়া কি বলিব? সে আসিবার কালীন উমিচাঁদ সম্বন্ধে

কত কথা যে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল।" (উমিচাঁদ-বাবু মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন)। যাক্ এই রকম ভয়ানক বিপদ ঘাড়ে করিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় চুয়াডাঙ্গায় নামিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সেখানের ষ্টেশন মাষ্টারকে বলা হইল যে এই আগের ষ্টেশনে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। তারপর আমরা বাসায় গিয়া যে যেখানে পাইলাম, অবসন্ন হইয়া সে রাতে শুইয়া পড়িলাম; ছোটবাবু ও দুই চারিজন অফিসের লোক সব ঠিক করিতে যাইলেন। সেখানে তিন দিন থাকিয়া অফিসের কার্য্য সারিয়া সকলে [illegible] বিমর্ষভাবে কলিকাতায় ফিরিলাম। এই শোকপূর্ণ ঘটনাটি কোন যোগ্য লেখকের হাতে পড়িলে কত যে জীবন্ত ছবি সকলের সম্মুখে পরিস্ফুট হইত।

আর একবার একটা বেশ বিপদে পড়ি। বেঙ্গল ডিরেক্টোরের বহির্ভূত মহেশগঞ্জ বা কোথায় একটা জঙ্গলদেশে যাইতে। নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে কতকটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ও গোরুর গাড়ীতে যাইতে হয়; দুটি হাতী ও কয়েকখানি গোরুর গাড়ী আমাদের জন্য প্রেরিত হয়। যাহারা গোরুর গাড়ীতে যাইবে, তাহারা দ্বিতীয় দলে চলিয়া গেল। আমি ছেলে মানুষির ঝোঁকে বলিলাম, যে "আমি হাতীর উপর যাইব।" ছোটবাবু মহাশয় কত বারণ করিলেন কিন্তু আমি হাতী কখন দেখি নাই! চড়া ত দূরের কথা। আমি

আমোদ হইল, আমি গোলাপকে বলিলাম, "দিদি, আমি তোমার সঙ্গে হাতীতে যাইব।" গোলাপ বলিল, "আচ্ছা,—যাস্!" সে আমায় তার সঙ্গে রাখিল। মা বকিতে বকিতে আগে চলিয়া গেলেন। আমরা সন্ধ্যা হয় এমন সময় হাতীতে উঠিলাম। আমি, গোলাপ ও আর দুইজন পুরুষ মানুষ একটাতে, আর চারিজন করিয়া অপর তিনটাতে। কিছু দূর গিয়া দেখি, এমন রাস্তা তো কখন দেখি নাই। মোটে এক হাত চওড়া রাস্তা। আর দুই পাশে বুক পর্য্যন্ত বন; বন গাছ কি জঙ্গল গাছ বলিতে পারি না—আর জল; ক্রমে সন্ধ্যা রাত্রি হইতে লাগিল, তখন বৃষ্টি চাপিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। হাতী তো ফর্ ফর্ করিতে লাগিল। শেষে সকলকে সেই বনের মধ্যে নামাইয়া ফেলিল। তার উপর কিনা বৃষ্টি; মাথার উপর চাউনী নাই, সেই জল, ঝড়, মেঘ গর্জ্জন, তার উপর বিদ্যুৎ, আমি তো কেঁদেই অস্থির। গোলাপও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হাতী আর এগোয় না। শুঁড় মাথার উপর তুলিয়া আগের পা বাড়াইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তখন মাহুত বলিল, যে "বাঘ বেরিয়েছে তাই হাতী যাইতেছে না।" মাহুত চারি জন হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। আমি তো ভাবিতেছি, আমার হাতী চড়ার আমোদ বাহির হইয়াছে। ভয়ে কেঁদে কাঁদিতে লাগিলাম; পাছে হাতীর উপর হইতে

অতিশয় আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তখন আমার অভিনয়ের অনেক বাকী আছে— কি হইবে! চারুবাবু আমায় ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ছোটবাবু মহাশয় কত স্নেহ করিয়া বলিলেন, যে "লক্ষ্মীটী! আজিকার রাত্রিটা কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া দাও।" তাঁহার সেই স্নেহময় সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্দ্ধেক দূর হইল। কোনরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতায় ফিরিলাম। ইহার পর আমি এক মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। ভাল হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সাবধানে থাকিতাম। কেননা তখন বেশী উচ্চ আশা হয় নাই। যাহা পাইতাম তাহাতেই সুখী হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পারিতাম, সেইটুকুই যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশী আশাও ছিল না, অনুভবও ছিল না। সকলে বড় ভাল বাসিত। হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিন কাটাইতাম।

এই সময় মাননীয় ৺ কেদারনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটারে যাইতেন। স্বর্গীয় কেদারবাবু আমার "কপালকুণ্ডলার" অভিনয় দেখিয়া বলিয়া ছিলেন, যে "এই মেয়েটী যেন প্রকৃত "কপালকুণ্ডলা" ইহার অভিনয়ে বন্য সরলতা উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরে শুনিয়াছিলাম এই সময়ে গিরিশবাবু মহাশয় ছোটবাবুকে বলেন, যে "আমরা একটী থিয়েটার করিব মনে করিতেছি। আপনি যত্তপি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে দেন তবে বড়ই ভাল হয়।" ছোটবাবু মহাশয় অতি উচ্চ-হৃদয়-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিনোদকে আমি বড়ই স্নেহ করি; উহাকে ছাড়িতে হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে। তথাপি আপনার অনুরোধ আমি এড়াইতে পারি না, বিনোদকে আপনি লউন।"

তারপর ছোটবাবু মহাশয় একদিন আমায় বলিলেন, যে "কিরে বিনোদ এখান হইতে যাইলে তোর মন কেমন করিবে না?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় লইয়া সেদিন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও বলিলেন, যে "ওসব কথা আমারও বেশ মনে আছে। তোমাকে ন্যেশন থিয়েটার হইতে আনিবার পরও শরৎবাবু মহাশয় আমাদের বলিয়া ৬ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বেনিফিট নাইটের "দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষার" ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য লইয়া যান; আরও কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই সময় হইতে আমি মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার শিক্ষায় আমার যৌবনের প্রথম হইতে জীবনের সার ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে।

সমাপ্ত করন্তি।" তিল সমাপ্ত অর্থে যাহ্। ক্রমে 'সীতার বনবাস" প্রভৃতি নাটক চলিল। থিয়েটারের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীর খ্যাতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

গিরিশবাবুর সহিত থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিয়া বিডন ষ্ট্রীটের "ষ্টার থিয়েটার" শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে বরাবর কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। কার্য্য-ক্ষেত্রে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা ছিলাম। তাঁহার নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্র আমিই অভিনয় করিতাম। তিনিও অতি যত্নে আমায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতেন।

যে সময় কেদারবাবু থিয়েটার করেন, সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় আসিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগ দেন। গিরিশবাবুর মুখে শুনিয়া ছিলাম, যে অমৃত মিত্র আগে যাত্রার দলে একটি করিতেন। তাঁহার গলার সুন্দর স্বর শুনিয়া তিনি প্রথমে থিয়েটারে লইয়া আসেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে "মেঘনাদ বধ", "বিষবৃক্ষ", "সধবার একাদশী", "মৃণালিনী", "পলাশীর যুদ্ধ" ও নানা রকম বড় বড় লেখকের বই নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। "মেঘনাদ বধে" অমৃতলাল রাবণ সাজেন এবং আমি এখানেও

Lakshmi Printing Works

সাতটী অংশ অভিনয় করিতাম। গিরিশবাবু মেঘনাদ ও রাম, "মৃণালিনীতে" গিরিশবাবু পশুপতি, আমি মনোরমা, "দুর্গেশ-নন্দিনীতে" গিরিশবাবু জগত সিংহ, আমি আয়েষা, "বিষবৃক্ষে" গিরিশবাবু নগেন্দ্রনাথ, আমি কুন্দনন্দিনী, "পলাশীর যুদ্ধে" গিরিশবাবু ক্লাইব, আমি বৃটেনিয়া, অমৃত মিত্র জগৎ শেঠ ও কাদম্বিনী রাণী ভবানী। কত পুস্তকের নাম করিব? সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পার্ট থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাটীতে বসিয়া, অমৃত মিত্র, অমৃত বাবু (ভুনী বাবু) আরো অন্যান্য লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি সেক্সপীয়ার, মিল্‌টন্, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা

হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্‌টার এক্‌ট্রেস্ আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অধ্যক্ষেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজি থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাটী আসিলে গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিতেন "কি রকম দেখে এলে বল দেখি?" আমার মনে যেখানে যেমন বোধ হইত; তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আমার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

৺কেদার বাবু প্রায় বৎসরেক থিয়েটার করেন; তাহার পর কৃষ্ণধন ও হারাধন বন্দোপাধ্যায় বলিয়া দুই ভাই কয়েক মাস থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার পর কাশীপুরের প্রাণনাথ চৌধুরীর বাটীর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়া একব্যক্তি ছয় মাস কি আট মাস এই থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হন। এই সকল থিয়েটারেই গিরিশবাবু মহাশয় ম্যানেজার ও মোশান মাষ্টার ছিলেন। কিন্তু সকল প্রোপ্রাইটারই স্ব স্ব প্রধান, গিরিশ বাবুও আফিসের কার্য্য করিয়া থিয়েটারে অধিক সময় দিতে পারিতেন না। সুতরাং এত বিশৃঙ্খল হইত যে ব্যবসা বুদ্ধিহীন আমোদ-প্রিয় প্রোপ্রাইটারেরা শেষে থলি ঝাড়া হইয়া শূন্য হস্তে

ইন্‌সল্‌ভেন্টের আসামী হইয়া থিয়েটার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। তত্রাচ আমার বেশ মনে পড়ে যে সে সময় প্রতি রাত্রেই খুব বেশী লোক হইত ও এমন সুন্দররূপ অভিনয় হইত যে লোকে অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়া একবাক্যে বলিত যে আমরা অভিনয় দর্শন করিতেছি কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা বোধ করিতে পারিতেছি না। এত বিক্রয় সত্বেও যে কেন সব ধনী সন্তানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। লোকে বলিত যে এই যায়গাটা হানা যায়গা। এই স্থানের ভূমিখণ্ড কাহাকেও অনুকূল নহে।

গিরিশ বাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত। আমার এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমায় বড়ই ভালবাসিতেন ও অতিশয় স্নেহ মমতা করিতেন। কেহবা কন্যার ন্যায় কেহবা ভগ্নীর ন্যায়, কেহবা সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমিও তাঁহাদের যত্নে ও আদরে তাঁহাদের উপর প্রবল স্নেহের অত্যাচার করিতাম। যেমন মা বাপের কাছে আদরের পুত্র কন্যারা বিনা কারণে আদর

দানদারের হাঙ্গামা করিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত করে, ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট যেমন তাহাদের কোলের ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি মিছামিছি ঝগড়া আবদার করে, আমারও সেই রকম স্বভাব হইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে নানা রকমের উচ্চ চরিত্র অভিনয় দ্বারা আমার মন যেমন উচ্চদিকে উঠিতে লাগিল, আবার নানারূপ প্রলোভনের আকাঙ্ক্ষাতে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইবার উপক্রম হইত।

আমি ক্ষুদ্র দীন দরিদ্রের কন্যা, আমার বল বুদ্ধি শক্তি ক্ষুদ্র। একদিকে আমার উচ্চ বাসনা আমার আত্ম-বলিদানের জন্য বাধা দেয়, অন্য দিকে অসংখ্য প্রলোভনের জীবন্ত চাকচিক্য মূর্ত্তি আমায় আহ্বান করে। এইরূপ অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-হৃদয়-বল কতক্ষণ থাকে? তবুও সাধ্যমত আত্মদমন করিতাম। বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিতে পারিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই। অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের সার সম্পদ ছিল। পাট অভ্যাস, পাট অনুযায়ী চিত্রকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে সেই সকল প্রকৃতির আকৃতি মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়া তন্ময় ভাবে সেই মনোঙ্কিত ছবিগুলিকে আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া দেখা,

এমন কি সেই ভাবে চলা, ফেরা, শয়ন, উপবেশন, যেন আমার স্বভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস সিড্‌নিস্ যখন থিয়েটারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, দশ বৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনর্ব্বার যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন সমালোচক কোন স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তক হইতে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। কোন্ একট্রেস বিলাতে বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেনটেরি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, হ্যামলেট কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম কত বলিব গিরিশবাবু মহাশয়ের ও অন্যান্য স্নেহশীল বন্ধুগণের যত্নে ইংরাজি, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মানি প্রভৃতি বড় বড় কবিদের কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ

করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম। এই কারণে আমার স্বভাব এমন হইয়া গিয়াছিল যে যদি কখন কোন উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সেখানকার ঘর বাড়ী আমার ভাল লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্প শোভিত নির্জ্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে আমি বুঝি এই বনের মধ্যে থাকিতাম, আমি ইহাদের চিরপালিত! প্রত্যেক লতা পাতায় সৌন্দর্য্যের মাখামাখি দেখিয়া আমার হৃদয় জুড়াইয়া পড়িত! আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিত! কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিয়া যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা করিয়া বেড়াইতাম। এখন আমার হৃদয় ছাড়িয়া এই তরঙ্গগুলি আপনা আপনি লুটোপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কুচবিহারের নদীর বালিগুলি অভ্র মিশান, অতি সুন্দর, আমি প্রায় বাসা হইতে দূরে, নদীর ধারে একলাটী যাইয়া সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহারা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।

নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্ব্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম, কল্পনার ভিতর আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, সেইজন্য বোধ হয় আমি যখন যে পার্ট অভিনয়

করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম, তাহা যে অপরের মনোমুগ্ধ করিবার জন্য বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি ইহা আমার কখন মনেই হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, ইহা যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। সেই কারণে সকলেই আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

একদিন বঙ্কিম বাবু তাঁহার 'মৃণালিনী' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি 'মৃণালিনী'তে 'মনোরমার' অংশ অভিনয় করিতেছিলাম। মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না, আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।" কয়েক মাস হইল এখনকার ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন যে "বিনোদ, তুমি কি সেই বিনোদ,—যাহাকে দেখিয়া বঙ্কিম বাবুও বলিয়াছিলেন যে আমার মনোরমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি?" যেহেতু প্রশংসা লোভে, লোকে প্রায়ই লালায়িত।

আমি অতি শৈশবকাল হইতে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী

হইয়া, বুদ্ধি বৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমায় কেমন উচ্ছ্বাসময়ী করিয়া তুলিয়াছিল, কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই বড়ই দুঃখ হইত। আমি সততই আদর ও সোহাগ চাহিতাম। আমার থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধবেরাও আমায় অত্যধিক আদর করিতেন। তাহা হউক এই সময় হইতে আমি আত্ম নির্ভর করিবার ভরসা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়াছিলাম।

এই সময়ের আর একটী ঘটনা বলি ;—প্রতাপ বাবুর থিয়েটারে আসিবার ঠিক আগেই হউক আর প্রথম সময়েই হউক, আমাদের অবস্থা গতিকে আমাকে একটী সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে থাকিতে হইত। তিনি অত্যন্ত সুজন ছিলেন; তাঁহার স্বভাব অতিশয় সুন্দর ছিল, এবং আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহগুণে আমায় তাঁহার কতক অধীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল, যে আমি থিয়েটারে কার্য্য না করি, কিন্তু যখন উহাতে কোন মতে রাজী হইলাম না, তখন তিনি বলিলেন, তবে তুমি অবৈতনিক ভাবে (এ্যামেচার) হইয়া কার্য্য কর, আমার গাড়ী ঘোড়া তোমায় থিয়েটারে লইয়া যাইবে ও লইয়া আসিবে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম, চিরকাল মাহিনা লইয়া কার্য্য করিয়াছি। আমার মায়ের ধারণা যে থিয়েটারের পয়সা হইতে আমাদের

দারিদ্র্যদশা ঘুচিয়াছে, অতএব ইহাই আমাদের লক্ষ্মী। আর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, মনের মত কাজ কারা হইয়া উঠিত না। হাড়ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইত, সেইজন্য মনেও বড় ইচ্ছা ছিল না। আমি একথা গিরিশ বাবু মহাশয়কে বলিলাম, তিনি বলিলেন যে তাহাতে আর কি হইবে, তুমি "অমুককে' বলিও যে আমি মাহিনা লই না। তোমার মাহিনার টাকাটা আমি তোমার মা'র হাতে দিয়া আসিব। যদিও প্রতারণা আমাদের চির সহচরী, এই পতিত জীবনের প্রতারণা আমাদের ব্যবসা বলিয়াই প্রতিপন্ন, তবুও আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আর আমি ঘৃণিতা বারনারী হইলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা বা মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অবিশ্বাস আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইলেও আমি সকলকেই বিশ্বাস করিতাম ও ভাল ব্যবহার পাইতাম। লুকোচুরি ভাঁড়াভাঁড়ি আমার ভাল লাগিত না। কি করিব দায়ে পড়িয়া আমায় গিরিশ বাবু মহাশয়ের কথায় সম্মত হইতে হইল। উক্ত ব্যক্তির সহিত গিরিশ বাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তিনি গিরিশ বাবুকে বড় সম্মান করিতেন। তিনি এত সজ্জন ছিলেন যে পাছে উঁহারা কিছু মনে সন্দেহ করেন বলিয়া কাজের আগে আমায় থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিতেন। সে যাহা হউক প্রতাপ

জহুরীর থিয়েটার বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতে ছিল; তিনিও অতিশয় মিষ্টভাষী ও সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। এইস্থানে যে যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছেন, কেবল প্রতাপ বাবুই ঋণগ্রস্ত হন নাই। লাভ হইয়াছিল কিনা জানি না অবশ্য তাহা বলিতেন না, তবে যে লোকসান হইত না, তাহা জানা যাইত। কেন না প্রতি রাত্রে অজস্র টিকিট বিক্রয় হইত, আর চারিদিকে সুনিয়ম ছিল। তাঁর বন্দোবস্তও নিয়নমত ছিল। সকল রকমে তিনি যে একজন ব্যবসায়ী লোক তাহা সকলেই জানিত ও জানেন। এক্ষণে আমার উক্ত থিয়েটার ছাড়িবার কারণ ও "ষ্টার থিয়েটার" সৃষ্টির সূচনার কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করি। গিরিশ বাবুর নূতন নূতন বই ও নূতন নূতন প্যান্টমাইমে আমাদের বড়ই বেশী রকম খাটিতে হইত। প্রতিদিন অতিশয় মেহনতে আমার শরীরও অসুস্থ হইতে লাগিল, আমি এক মাসের জন্য ছুটী চাহিলাম, তিনি অনেক জেদাজেদির পর ১৫ দিনের ছুটী দিলেন। আমি সেই ছুটীতে শরীর সুস্থ করিবার জন্য ৺কাশীধামে চলিয়া যাইলাম। কিন্তু সেখানে আমার অসুখ বাড়িল। সেই কারণ আমার ফিরিয়া আসিতে প্রায় এক মাস হইল। এখানে আসিয়া পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে প্রতাপ বাবু আমার ছুটীর সময়ের মাহিনা দিতে চাহেন না। গিরিশবাবু বলিলেন

যে 'ছুটীর মাহিনা না দিলে বিনোদ কাজ করিবে না, তখন বড় মুস্কিল হইবে। যদিও স্পষ্ট শুনি নাই, তবু এই রকম শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, বড় রাগ হইল। আমার একটুতে যেন মনের ভিতর আগুন লাগিয়া যাইত, আমি চোখে কিছু দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনই প্রতাপ বাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মাহিনা কেয়া? তোম তো কাম নেহি—কিয়া!" আর কোথা আছে;—"বটে মাহিনা দিবেন না" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আর গেলাম না! তারপর গিরিশ বাবু, অমৃত মিত্র আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমি তখন গিরিশ বাবুকে বলিলাম যে "মহাশয়, আমার বেশী মাহিনা চাহি, আর যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা চুক্তি করিয়া চাহি, নচেৎ কাজ করিব না। তখন অমৃত মিত্র বলিলেন, "দেখ বিনোদ এখন গোল করিও না, একজন মাড়োয়ারীর সন্তান, একটী নূতন থিয়েটার করিতে চাহে; যত টাকা খরচ হয় সে করিবে। এখন কিছুদিন চুপ করিয়া থাক, দেখি কতদূর কি হয়!"

এইখান হইতেই "ষ্টার থিয়েটার" হইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। আমিও গিরিশবাবুর কথা অনুযায়ী আর প্রতাপ বাবুকে কিছু বলিলাম না। তবে ভিতরে ভিতরে সংবাদ লইতে লাগিলাম কে লোক নূতন থিয়েটার করিতে চাহে?

পত্র।

ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা।

মহাশয়!

এই সময় আমায় অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় পতিতা ভাগ্যহীনা বার-নারীদের টাল বেটাল তো সর্ব্বদাই সহিতে হয় তবুও তাহাদের সীমা আছে; কিন্তু আমার ভাগ্য চির দিনই নিরূপ ছিল। একে আমি জ্ঞানহীনা অধম স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্য পথ সতত‌ই দোষনীয়, আমরা ভাল পথ দিয়া যাইতে চাহিলে, মন্দ আসিয়া পড়ে ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়! অথচ আমাদের প্রতি স্নেহ চক্ষে দেখিবার বা অসময় সাহায্য করিবার কেহ নাই! যাহা হউক; আমার মর্ম্ম ব্যথা শুনুন।

আমিও এই সময় ৬ প্রতাপ বাবু মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগ করিব মনে মনে করিয়াছিলাম। ইহার আগে আর একটী ঘটনার দ্বারা আমায় কতক ব্যথিত হইতে

হইয়াছিল। আমি যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন, ইহার কয়েক মাস আগে তিনি বিবাহ করেন ও ধনবান যুবকবৃন্দের চঞ্চলতা বশতঃ আমার প্রতি কতক অসৎ ব্যবহার করেন। তাহাতে আমাকে অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়। সেই কারণে আমি মনে মনে করি যে ঈশ্বর তো আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামর্থ্য দিয়াছেন, এইরূপ শারীরিক মেহনত দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না। আমা হইতে যদি একটী থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্ন সংস্থান করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ "ষ্টার থিয়েটার" করিবার জন্য ৺গুর্ম্মুখ রায় ব্যস্ত। ইহা আমি আমাদের একটারদের নিকট শুনিলাম এবং দৈব-চক্রে এই সময় আমার আশ্রয়দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকও কার্য্যানুরোধে দূরদেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এদিকে অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, তুমি যে প্রকারে পার আর একটী থিয়েটার করিবার সাহায্য কর। থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ

করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। গিরিশবাবু বলিলেন থিয়েটারই আমার উন্নতির সোপান। তাঁহার শিক্ষা সাফল্য আমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটার হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়। এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল। থিয়েটারের বন্ধুবর্গেরা ও দিন দিন অনুরোধ করিতেছেন, আমি মনে করিলেই একটা নূতন থিয়েটার সৃষ্টি হয় তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু যে যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাকেও স্মরণ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই যুবা অনুপস্থিত, উপস্থিত বন্ধুবর্গের কাতরোক্তি, মন থিয়েটারের দিকেই টলিল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন. অপর পুরুষে যেরূপ প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে, তাঁহারও সেইরূপ। তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিয়া ছিলেন যে আমিই তাহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়! তিনি বিষয় কার্য্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় কার্য্য নয়, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তবে তাঁহার ভালবাসা কোথায়? এতো প্রতারণা! আমি কি নিমিত্ত বাধ্য থাকিব? এরূপ নানা যুক্তি হৃদয়ে

উঠিতে লাগিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার মনে হইতে লাগিল, যে সেই যুবার দোষ নাই, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী হয়ে এ কি করিতেছি! রাত্রে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় কাটিত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ স্তুতি ও আদরের মনোভাব একবারে ঠেলিয়া ফেলিত। থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার মন আমার সহিত প্রতারণা করে নাই। ইহা যতদূর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব তাহা পাইয়া ছিলাম। কিন্তু দিন ফিরিবার নয়, দিন ফিরিল না। এ প্রমাণের কথা মহাশয়কে সংক্ষেপে পশ্চাৎ জানাইব।

থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরঋণীভুক্ত, তাহারাও সকল কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম। একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চির প্রথা হইলেও এ অবস্থায় আমায় বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয় তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনায় প্রতারণায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থিরচিত্তে ভাবিতেন তাহা

হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়া ছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি! কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয়পূর্ণ ছিল তাহা একবারে নির্ম্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিষ্ণু-পরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই বারাঙ্গনা একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনি বৈষ্ণবী হন, এ কথা জগৎ ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয় শূন্য হইলে কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই। এই আমাদের সংসারে অপরাধ। নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবু মহাশয়ের যে "বারাঙ্গনা" বলিয়া একটী কবিতা আছে, তাহা এই দুর্ভাগিনীদের প্রকৃত ছবি। "ছিল অন্য

নারী সম হৃদয় কমল।" অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়! আমাদেরও তাহাই। উৎপীড়িত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে। যাহা হউক, এখন ও কথা থাকুক। এই পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেননা যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটী থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সংকল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতঃই হউক, কিম্বা নিজের জেদ বশতঃই হউক, নানারূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বাধা বড় সহজ বাধা নহে! তিনি নিজের জমিদারী হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া বাড়ী ঘেরোয়া করিলেন; গুর্ম্মুখ বাবুও বড় বড় গুণ্ডা আনাইলেন, মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। এমন কি একদিন জীবন সংশয় হইয়াছিল! একদিন রিহারস্যালের পর আমি আমার ঘরে ঘুমাইতেছিলাম, জোর ছটকি হইতে, ঝন্ ঝন্ ঝম্ ঝম্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! দেখি যে মিলিটারি পোষাক পরিয়া তরওয়াল বাঁধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝ-খানে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "ঐ যে কেনি এত ঘুম কেন?" আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে, বলিল যে, "দেখ বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সকলই দিব!

এই দশ হাজার টাকা লও ; যদি বেশি হয় তবে আরও দিব।” আমি চিরদিনই একগুঁয়ে ছিলাম, কেহ জেদ করিলে আমার এমন রাগ হইত যে, আমার দিক্‌বিদিক্‌ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না। যাহা রোক্‌ করিতাম কিছুতেই তাহা টলাইতে পারিত না ! মিষ্ট কথায় স্নেহের আদরে যাহা করিব স্থির করিতাম, কেহ জোর করিয়া নিষেধ করিলে, সে কাজ করিতাম না ; জোরের সহিত কাজ করান আমার সহজ সাধ্য ছিলনা। তাহার ঐরূপ উদ্ধত ভাব দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, আমি বলিলাম, “না কখনই নহে, আমি উহাদের কথা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যতিক্রম করিতে পারিব না।” তিনি বলিলেন, “যদি টাকার জন্য হয়, তবে আমি তোমায় আরও দশ হাজার টাকা দিব।” তাহার কথায় আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল ! দাঁড়াইয়া বলিলাম, যে-রাখ তোমার টাকা ! টাকা আমি উপার্জ্জন করিয়াছি বহু টাকা আমায় উপার্জ্জন করে নাই ! ভাগ্যে থাকে অমন দশ বিশ হাজার আমার কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া নিজের তরওয়ালে হাত দিয়া বলিলেন, “বটে !—ভেবেচ কি যে তোমায় সহজে ছাড়িয়া দিব, তোমায় কাটিয়া ফেলিব ! যে বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতে ছিলাম তাহা অন্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে ; বলিতে বলিতে খাঁ করিয়া কোষ হইতে

তরবারি বাহির করিয়া, চক্ষের নিমিষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন। আমার দৃষ্টিও তাহার তরবারির দিকে ছিল, যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত আমি অমনি একটী টেবিল হারমোনিয়ম ছিল তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম; আর সেই তরবারির চোট্ হারমোনিয়মের ডালার উপর পড়িয়া ডালার কাঠ তিন আঙ্গুল কাটিয়া গেল। নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া লইয়া আবার আঘাত করিলেন, তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজান হইত তাহাতে পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি উঠিয়া তাহার পুনঃ উদ্যত তরওয়াল শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম কি করিতেছ, যদি কাটিতে হয় পরে কাটিও; কিন্তু তোমার পরিণাম? আমার কলঙ্কিত জীবন গেল আর রহিল তাতে ক্ষতি কি। একবার তোমার পরিণাম ভাব, তোমার বংশের কথা ভাব, একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ছি! ছি! শুন! স্থির হও! কি করিতে হইবে বল? ঠাণ্ডা হও! শুনিয়া ছিলাম দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের প্রথম বেগ শমিত হইলে লোকের প্রায় হিতাহিত ফিরিয়া আইসে! এ তাহাই হইল, হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন! তাহার সে সময়ের কাতরতা বড়ই কষ্টকর! আমার মনে হইল যে সব দূরে যাউক, আমি

আবার ফিরিয়া আসি। কিন্তু চারিদিক হইতে তখন আমায় অষ্ট বজ্র দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশবাবু মহাশয় বাঁধিয়া ফেলিয়া ছিলেন; কোন দিকে ফিরিবার পথ ছিল না! যাহা হউক, সে হইতে তখন তো পার পাইলাম! তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন! এদিকে আমরা যে কয়জন একত্র হইয়াছিলাম সকলে ৺ প্রতাপবাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম। এখন ৺ গুর্ম্মুখ বাবুও ধরিলেন যে আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে মাস কতক দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখন রাণীগঞ্জে, কখন এখানে ওখানে আমায় থাকিতে হইল। ইহার ভিতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল, যে বিডন ষ্ট্রীটে প্রিয় মিত্রের যায়গা লিজ্ লইয়া এত দিন থিয়েটার হইবে, এত টাকা খরচ হইবে; তখন আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি কলিকাতায় আসিবার কয়েক দিন পরে একদিন গুর্ম্মুখ বাবু বলিলেন, যে "দেখ বিনোদ। আর থিয়েটারের গোলযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট লও! আমি একেবারে তোমায় দিতেছি!" এই বলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিলেন। আমি থিয়েটার ভালবাসতাম,

সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্দ্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম। যখন অমৃত মিত্র প্রভৃতি শুনিলেন, যে গুর্মুখ রায় থিয়েটার না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আমায় দিতে চান, তখন তাঁহাদের চিন্তার সীমা রহিল না। যাহাতে আমি সে অর্থ গ্রহণ না করি, ইহার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হইল না, কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টা তখন নিষ্প্রয়োজন। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটার ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোন মতে তাঁহার বাধ্য হইব না। তখন আমারই উদ্যমে বিডন ষ্ট্রীটে জমি লিজ্ লওয়া হইল, এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুর্মুখ রায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। উক্ত বিডন ষ্ট্রীটেই বনমালী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী ভাড়া লইয়া রিহারসাল আরম্ভ হইল, তখন একে একে সব নূতন পুরাতন একটার একট্রেস্ আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু মহাশয় মাষ্টার ও ম্যানেজার হইলেন এবং বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু আসিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ্ লন, তখন বোধ হয় আমরা ৺ প্রতাপবাবুর থিয়েটারে; সেই সময় কোন কারণ বশতঃ জোড়া মন্দিরের পাশে ঐ সিমলাতে আমাদের একটী বাড়ী ভাড়া ছিল। সে বাড়ীতে ভুনীবাবুও প্রায়ই

যাইতেন ও কার্য্যানুরোধে কয়েক দিন বাসও করিয়া ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস্ দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূরদেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই। পরে যখন আমাদের নূতন থিয়েটার হইল, তখন ভুনীবাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন। সেই সময় প্রফেসর জহরলাল ধর ষ্টেজ ম্যানেজার হন। দাসুবাবু যদিও ছেলে মানুষ কিন্তু কার্য্য শিখিবার জন্য গিরিশবাবু মহাশয় উঁহাকে সহকারী ষ্টেজ ম্যানেজার করেন এবং হিসাব পত্র সব ভাল থাকিবে ও বন্দোবস্ত সব সুশৃঙ্খলে হইবে বলিয়া তিনি এখনকার প্রোপ্রাইটার বাবু হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়কে আনিয়া সকল ভার দেন। হরিবাবু মহাশয় চিরদিনই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান! গিরিশবাবু মহাশয় নূতন থিয়েটারের বেশী উন্নতি করিবার জন্য শিক্ষা-কার্য্যে অনেক সময় অতি-বাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সেজন্য সুযোগ্য লোক দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের উপর এক এক কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়া ছিলেন। অতি উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা ২।৩ টার সময় রিহারসালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম; এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে

আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া করিয়া মাটী বহিয়া পিট, ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুড়ি পিছু চারিকড়া করিয়া কড়ি ধার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন, আমি গুর্মুখবাবু আর ২।১ জন রাত্রে জাগিয়া কার্য্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে? অতি উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যয়ে থিয়েটার প্রস্তুত হইল। বোধ হয় এক বৎসরের ভিতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার সহিত আমি আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে "এই যে থিয়েটার হাউস্ হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার নামটী বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।" এই আনন্দে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন—তাহা জানিনা; যেপর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রি না হইয়াছিল, সেপর্য্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে "নাম" হইবে। কিন্তু যেদিন উঁহারা রেজেষ্ট্রি করিয়া আসিলেন— তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহ কয়েক বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের

নূতন নাম কি হইল ? দাসুবাবু প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন যে "ষ্টার।" এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম "বেশ!" পরে মনে ভাবিলাম যে উঁহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন ? কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই! আমি তখন একেবারে উঁহাদের হাতের ভিতরে! আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন ভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখন কাহা-কেও কোন কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ঐ ব্যবহার বরাবর মনে ছিল! বলা বৃথা বলিয়া আর কিছু বলি নাই। আর থিয়েটার আমার বড় প্রিয়, থিয়েটারকে বড়ই আপনার মনে করিতাম, সাহাতে তাহাকে আর একটী নূতন থিয়েটার তো হইল; সেই কারণে সেই সময় তাহা চাপাও পড়িয়া যাইত। কিন্তু থিয়েটার প্রস্তুত হইবার পরও সময়ে সময়ে বড় ভাল ব্যবহার পাই নাই! আমি যাহাতে উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি তাহার জন্যও সকলে

বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাদের উদ্যোগ ও যত্নে আমাকে মাস দুই ঘরে বসিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর আবার গিরিশবাবুর যত্নে ও স্বত্বাধিকারীর জেদে আমায় পুনরায় যোগ দিতে হইয়াছিল। লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে প্রোপ্রাইটার বলিয়াছিলেন "এতো বড় অন্যায়, যাহার দরুন থিয়েটার করিলাম তাহাকে বাদ দিয়া কার্য্য করিতে হইবে? এ কখন হইবে না।" তাহা সব পুড়াইয়া দিব। সে যাহা-হউক, এক সঙ্গে থাকিতে হইলে ত্রুটী অনেক হইয়া থাকে, আমারও শত সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমায় বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ মাননীয় গিরিশবাবুর স্নেহাধিক্যে আমার মান অভিমান একটু বেশী প্রভুত্ব করিত; সেইজন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিনয় কার্য্যের উৎসাহের জন্য সকলেই প্রশংসা করিতেন, এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের ভাগই অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম স্নেহ কখন ভুলিতে পারিব না! এই থিয়েটারে কার্য্যকালীন কোন সুকার্য্য করিয়া থাকি আর না করিয়া থাকি প্রবৃত্তির দোষে বুদ্ধির বিপাকে অনেক অন্যায় করিয়াছি সত্য! কিন্তু এই কার্য্যের দরুন অনেক ঘাত প্রতিঘাতও সহিতে হইয়াছে! এইরূপ নানাবিধ টাল বেটালের পর যখন নূতন "ষ্টারে" নূতন পুস্তক "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন সকলেরই মনো-

মালিন্য এক রকম দূরে গিয়াছিল। সকলেই জানিত যে এই থিয়েটারটী আমাদের নিজের। আমরা ইহাকে যেমন বাহ্যিক চাকচিক্যময় করিয়াছি তেমনিই গুণময় করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও অধিক করিব। সেই কারণ সকলে আনন্দে, উৎসাহে এক মনে অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতেন।

এখানকার প্রথম অভিনয় "দক্ষযজ্ঞ"। ইহাতে গিরিশবাবু মহাশয় "দক্ষ", অমৃত মিত্র "মহাদেব", ভুনীবাবু "দধীচি"। আমি "সতী", কাদম্বিনী "প্রসূতি" এবং অন্যান্য সুযোগ্য লোক সকল নানাবিধ অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কম্পন— বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব "দক্ষযজ্ঞ" ব্যাপার! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি যখন স্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবুর "দক্ষ", অমৃত মিত্রের "মহাদেব" যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার"

বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন, তখন বোধহয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধহয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত। যাহাহউক, এই থিয়েটার হইবার পর গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের আগ্রহ উৎসাহে দিন দিন উজ্জ্বলতর উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। এই থিয়েটারেই কার্য্যকালীন নানাবিধ গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উৎসাহ পাইয়া আমার কার্য্যের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে পারিলাম। অভিনয় কার্য্য যে রঙ্গালয়ের রঙ্গ নহে, তাহা যে শিক্ষা করিবার ও দীক্ষা দিবার বিষয়। অভিনয়-কার্য্য যে হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া লইয়া সে কার্য্য মন ও হৃদয় এক করিয়া লইতে হয়; তাহাতে কতকটা আপনাকে ঢালিয়া মিলাইয়া লইতে হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম, এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদিগের যে কতদূর উচ্চ কার্য্য সমাধার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইলাম। সেই কারণ সতত যত্নের সহিত হৃদয়কে সংযম রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ভাবিতাম যে ইহাই আমার কার্য্য ও ইহাই আমার জীবন। আমি প্রাণপণ

যত্নে মহামহিমান্বিত চরিত্র সকলের সম্মান রক্ষা করিতে হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিব। ইহার পর গিরিশবাবুর লিখিত সব উচ্চ অঙ্গের পুস্তক অভিনয় হইতে লাগিল। মধ্যস্থানে সমাজ পীড়নে বা অন্য কারণে হউক গুর্ম্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। সেই সময় হরিবাবু, অমৃত মিত্র, দাশুবাবু কিছু কিছু টাকা দিয়া ও কতক টাকা স্বর্গাগত মাননীয় হরিধন দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া ও তখন এক্জিবিসনের সময়, প্রত্যহ অভিনয় চালাইয়া সেই টাকার দ্বারা "ষ্টার থিয়েটার" নিজেরা ক্রয় করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসুও একজন প্রোপ্রাইটার হইলেন। এই সময় নানা কারণে ও অসুস্থ হইয়া গুর্ম্মুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন যে, এই থিয়েটার যাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহাকেই ইহার স্বত্ব দিব, অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধেক স্বত্ব তাহার থাকিবে, নচেৎ আমি হস্তান্তর করিব না।

সেই সময় গুর্ম্মুখবাবুর ইচ্ছায় আমারও সমান অংশ লইবার কথা উঠিল। লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে গুর্ম্মুখবাবু বলিয়াছিলেন যে ইহাতে বিনোদের অংশ না থাকিলে আমি কখন উহাদিগকে দিবনা। এদিকে কিন্তু গিরিশবাবু মহাশয় তাহাতে রাজি হইলেন না, তিনি আমার মাকে বলিলেন যে "বিনোদের মা ও সব ঝঞ্ঝটে

তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত ঝঞ্চট বহিতে পারিবে না"। আমরা "আদার ব্যাপারি আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই"। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখন অন্যত্র কার্য্য করিব না ; আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না ! আমরা কার্য্য করিব ; বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই ! গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব। গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোন মতেই রাজি হইলেন না। যেহেতু আমার মাতা-ঠাকুরাণীও গিরিশবাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এই রকম নানাবিধ ঘটনায় ও রটনায় বহু দিবসাবধি লোকের মনে ধারণা ছিল যে "ষ্টারে" আমার অংশ আছে ! এমন কি অনেকবার লোকে আমায় স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তোমার কত অংশ" ? সে যাহাহউক, এই থিয়েটার ইঁহাদের নিজের হাতে আসিবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে এক্‌জিবিসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তখনও এক্‌জিবিসন চলিতেছে, কত দেশ দেশান্তরের লোক কলিকাতায় ! আমাদের উদ্যোগ, উৎসাহ, আনন্দ দেখে কে ? এই সময় আবার আমরা সব ঐক্য হইলাম। যে যাহার কার্য্য করিতে লাগিল, তাহা যেন তাঁরই নিজের

কার্য্য। এই সময় সুবিখ্যাত "নল-দময়ন্তী", "ধ্রুবচরিত্র", "শ্রীবৎস-চিন্তা" ও প্রহ্লাদচরিত্র নাটক প্রস্তুত হয়।

এই থিয়েটারের যতই সুনাম প্রচার হইতে লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় ততই যত্নে আমায় নানাবিধ সৎশিক্ষা দিয়া কার্য্যক্ষম করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এই বার "চৈতন্যলীলা" নাটক লিখিত হইল এবং ইহার শিক্ষাকার্য্যও আরম্ভ হইল। এই "চৈতন্যলীলা"র রিহার্সালের সময় "অমৃতবাজার পত্রিকার" এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে, "আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম "হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।" যেদিন প্রথম চৈতন্য-লীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই; প্রাণের মধ্যে একটা আকুল

উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম ; পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে, "মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহা সঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করিতে পারি" ; কিন্তু সারা দিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধহয় ব্যর্থ হয় নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহু সংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় "রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী ?" সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম, আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি। আমার

দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত। চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার! সকলই সেই কৃষ্ণ" তখন সত্যই মনে হইত যে "কেবা কার।" পরে যখন উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

"গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী অশরীরি প্রাণী!"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে; আমি তো কেহই নহি! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদনা নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুরুগুর্ করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী

মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শক-বৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি ভবে একা দাওহে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায়॥" এই গানটী গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত! উন্মত্ত ভাবে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম। এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম!

একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি, সেদিন অতিশয় লোকারণ্য হইয়াছিল। "চৈতন্যলীলায়" অভিনয়ে প্রায় অধিক লোক হইত। তবে যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশী লোক সকল আসিতেন তখন আরও রঙ্গালয় পূর্ণ হইত এবং প্রায় অনেক গুণী লোকই আসিতেন। মাননীয় ফাদার লাফোঁ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপসিনের পরেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন; আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন যে "চল আমি

একবার দেখিব।" গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন; পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত বড় দাড়িওয়ালা সাহেব ঢিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন, ইঁহাকে নমস্কার কর। ইঁনি মহামান্বিত পণ্ডিত "ফাদার লাফোঁ।" আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। আমি হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন। আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া আপন কার্য্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মুচ্ছির্ত হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, এবার তাহা হয় নাই; কেন তাহা বলিতে পারিনা! এই চৈতন্যলীলা অভিনয় জন্য আমি যে কত মহামহো-পাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারিনা। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণু-প্রেমিক পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার পবিত্র পদ ধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তি-ভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্য-

লীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্য-লীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺ পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন! অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন; "হরি গুরু, গুরু হরি", বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি", তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্ত্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিত-পাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরক সদৃশ করিয়াছি।

আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগাক্রান্ত প্রসন্ন বদনে আমায় বলিলেন, "আয় মা বোস", আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের

কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান ? কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) "সত্যং শিবং" মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমার থিয়েটার কার্য্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করিনা। কেননা আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৮ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব" আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পিযূষ পূরিত আশাময়ী বাণী— "হরি গুরু, গুরু হরি" আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি, তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে, বল—"হরি গুরু, গুরু হরি।" এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন মনে নাই। তবে "স্বপ্নে" যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

ইহার পর "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" অভিনয় হয়। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথমভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ। আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমায় প্রায় একমাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদ-

কারী; কিন্তু যখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত সাকার ও নিরাকার বাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর ষড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ, সেই স্থান অভিনয় যে কত-দূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না। সেই সকল স্থান অভিনয়কালীন মনের আবেগ যতদূর প্রয়োজন; আবার দেহের শক্তিও ততদূর দরকার। কেননা সেই সপ্ত হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর সংযোগে একভাবে মনের আবেগে মনে হইত যে আমি বুঝি এখনি পড়িয়া যাইব। আর সেই ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন "ঐ ঐ আমার কালাচাঁদ" বলিয়া আত্মহারা! ইহা বলিতে যত সহজ কার্য্যে যে কতদূর কঠিন ভাবিতেও ভয় হয়! এখনকার এই জড়, অপদার্থ দেহে যখন সেই সকল কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যে কেমন করিয়া আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতাম। তাই মনে মনে হয় যে, সেই মহাপ্রভুর দয়া ব্যতীত আমার সাধ্য কি? আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" আর অভিনয় হয় নাই। এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রহসন "বিবাহ বিভ্রাট" প্রস্তুত হয়। ইহাতে আমি "বিলাসিনী কারফরমার" অংশ অভিনয় করি! কি বিষম বৈষম্য! কোথায় জগতপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্য

চরিত্র; আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা হিন্দু সমাজ বিরোধী সভ্যা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা চরিত্র! আমি তো ছয় সাত মাস ধরিয়া এক সঙ্গে "চৈতন্য" ও "বিলাসিনীর" অংশ অভিনয় করিতে সাহস করি নাই। যদিও পরে অভিনয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে তবে সাহস হইয়াছিল। অভিনয়কালীন কত যে বাধা বিপত্তি সহিতে হইত, এখন মনে হইলে আমি যে কেমন করিয়া এত কষ্ট সহিতাম। সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পড়িতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোন স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয় ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আর একটী পরিবর্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহার অধীন হইব না। ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড়বৎসর ছিল এবং সেই সময় আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্য্য স্থানে যাইতাম, আপনার কার্য্য সমাধা

আবার থিয়েটারে কার্য্যকালীন, সময়ে সময়ে কত দৈববিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার প্রমীলার চিতা-আরোহণ সময়ে পরিহিত মাথার কাপড় ও চুল একেবারে জ্বলিয়া উঠে। একবার বৃটেনিয়া সাজিয়া শূন্যে তারের উপর হইতে নীচে একেবারে পড়িয়া যাই। এইরূপ দৈববিপাকে যে কতবার পড়িয়াছি কত আর বলিব! অভিনয়কালীন যেমন আমার পার্টের দিকে মন থাকিত, তেমনি পোষাক পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও যত্ন ছিল। ভূমিকা উপযোগী সাজিবার ও সাজাইবার আমার সুখ্যাতি ছিল। যখন নলদময়ন্তীর নূতন অভিনয় হয়, সেই সময় "নল"কে রং ও ড্রেস করিয়া দিবার জন্য কোন সাহেবের দোকান হইতে এক সাহেব আসিয়াছিল। যেহেতু অমৃতলাল মিত্র মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। রং ও পরচুলা অনেক টাকার আসিল। আমাকেও অনেকে বল্লেন যে "তুমিও রং করিয়া লও।" আমি বলিলাম যে আগে নল মহাশয়ের রং করা দেখি। পরে "নলে"র রং করা দেখিয়া আমার মনঃপূত হইল না, বরং হাসি পাইল। যেন তেলচিটা তেলচিটা মনে হইতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম যে "না মহাশয় আমার ড্রেস ও রং আমি আপনি করিতেছি দেখুন! তখন আমি পোষাক ও রং সম্পূর্ণ করিলাম, সকলে দেখিয়া বলিলেন যে এই রং বেশ হইয়াছে। সেই অবধি

অমৃতবাবু যতবার "নল" সাজিতেন ততবারই আমি রং করিয়া দিতাম। অন্য কেহ রং করিয়া দিলে তাঁর পছন্দ হইত না। ইহার দরুন অন্য একট্রেসরা সময়ে সময়ে অসন্তুষ্ট হইত। আমার একদিন তাড়াতাড়ি থাকাতে বনবিহারিণী (ভুনী) নাম্নী একজন অভিনেত্রী বলিয়াছিল যে, "আসুন অমৃতবাবু, আমি রং করিয়া দিই; অমৃতবাবু তাহার উত্তরে বলেন যে "রং ও পোষাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের হইতে উত্তম!" আমি সকল সময়েই নিজে নিজের পোষাক ও রং করিতাম, ড্রেসারেরা শুধু সংগ্রহ করিয়া দিতেন। আমি এমন সুরুচিসম্পন্নরূপে ড্রেস করিতে পারিতাম যে আমার পোষাকের কেহই প্রায় নিন্দা করিত না। আমার মাথার চুলগুলিকে যখন যে ভাবে প্রয়োজন হইত সেই ভাবেই বিন্যস্ত করিতে পারিতাম। আমার চুলের কালিংগুলি এত সুন্দর হইত যে গিরিশবাবু মহাশয় আদর করিয়া বলিতেন যে, "একজন ইটালিয়ন কবি বলিতেন তাঁহার পুস্তকের একটী সুন্দর বালিকার মুখের এক স্থানের একটী তিলের জন্য তাঁহার জীবন দিতে পারিতেন; তোমার এই চুলের কালিংগুলি দেখিলে ইহার কত দাম ঠিক করিতেন বলিতে পারি না"। হইতে পারে গিরিশবাবু আমায় স্নেহ করিতেন বলিয়া খুব বেশী বলিতেন, কিন্তু আমার ড্রেসের কেহ কখন নিন্দা

পত্র।

শেষ সীমা।

মহাশয় !

আপনাকে আর কত বিরক্ত করিব ! এ ভাগ্যহীনার কলঙ্কিত জীবনের পাপকথাদ্বারা আপনাকে আর কত জ্বালাতন করিব ; কিন্তু আপনার দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া এ পাপজীবনের ঘটনা মহাশয়কে নিবেদন করিতে সাহস করি। সেইকারণে নিবেদন এই যে, যদি এতদিন দয়া করিয়া ধৈর্য্যদ্বারা আমার যন্ত্রণাময় কথা শুনিয়াছেন ; তবে শেষটাও শুনুন !

মানুষ যদি আপনার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত ; তাহা হইলে গর্ব্ব অহঙ্কার সকল পাপই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইত ! কি ছিলাম, কি হইয়াছি ! তখন যদি বুঝিতাম যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর দিতেও পারেন এবং নিতেও পারেন ; তাহা হইলে কি মান অভিমানের খেলা লইয়া বৃথা দিন কাটাইতাম ! এখন দিন গেছে, কথাই আছে,

আর আছে স্মৃতির জ্বালা! পাপের অনুতাপ! কিন্তু ঈশ্বর দয়াময় তাহাও নিশ্চয়! জীব যতই অধঃপতিত হউক না কেন তাঁর দয়াতে বঞ্চিত নহে। তিনিই দেন, তিনিই লন, ইহাও তাঁহার করুণা, ইহাতে আক্ষেপ নাই। সেই অসীম করুণাময় এই নিরাশ্রয়া পতিতা ভাগ্যহীনাকে একটী সুশীতল আশ্রয়স্থল দিয়াছেন। যেখানে বসিয়া এই দুর্বিসহ বেদনাপূর্ণ বুক লইয়া একটু শান্তিতে ঘুমাইতে পাই! ইহা তাঁহারি করুণা! এখন শেষ কথাগুলি শুনুন!

আমি যে সময় থিয়েটারে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ের দু'একটী কথা বলি। আমি এত বালিকা বয়সে অভিনয় কার্য্যে রত হইয়া ছিলাম যে, আমি যখন "সরোজিনী"তে "সরোজিনী"র অংশ অভিনয় করিতাম, তখন এখনকার "ষ্টারের" সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয় ঐ নাটকে "বিজয়-সিংহের" অংশ অভিনয় করিতেন। তিনি এখনও বলেন, "সে সময় তোমার সহিত আমার বিজয়সিংহের ভূমিকা লইয়া প্রেমাভিনয় করিতে বড় লজ্জা হইত। কিন্তু অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইত যে একদিন অভিনয়কালীন "ভৈরবাচার্য্য" যখন "সরোজিনী"কে বলি দিতে যায়, সেই সময় দর্শকবৃন্দ এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে ফুটলাইট ডিঙ্গাইয়া ষ্টেজে উঠিতে উদ্যত। তাহাতে মহা গোলযোগ হইয়া ক্ষণেক অভিনয়কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়া ছিল। ইহা তোমার মনে আছে কি?"

"বিষবৃক্ষে" আমি "কুন্দের" অংশ অভিনয় করিতাম। আমাদের মতন চঞ্চলস্বভাবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই ভীরুস্বভাবা শান্ত, স্নিগ্ধ, একটুকু হৃদয়মধ্যে অসীম ভালবাসা লুকাইয়া আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত হইয়া পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়া তাহার উপর দুর্নীতি দশাতেই হউক, আর অদৃষ্ট দোষেই হউক, সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে তাহা আপনার সহস্রগুণ রূপে, গুণে, সহায় সম্পদে যে মানে উচ্চ সেই আশ্রয়দাতাকে দান করিয়া অতিশয় ভীরুতার সহিত সেই বেদনাভরা বুক বাঁধিয়া, বুকের মধ্যে লুকাইয়া সেই আশ্রয়দাতাকে আত্মসমর্পণ করিয়া সশঙ্কিত হরিণীর ন্যায় দিন কাটান। উপায় নাই, অবলম্বন নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, আত্ম নির্ভরতাও নাই, এই ভাবে অভিনয় করিতে যে কত ধৈর্য্য প্রয়োজন; তাহা সকলে অভিনেত্রী ব্যতীত অনুভব করিতে পারিবেন না! এই সময় মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয় আমার সহিত "নগেন্দ্রনাথের" অংশ অভিনয় করিতেন।

"বিষবৃক্ষে"র "কুন্দে"র অভিনয়ের পরেই "সধবার একাদশীর" "কাঞ্চন"। কি স্বভাব সম্বন্ধে, কি কার্য্য সম্বন্ধে কত প্রভেদ! অভিনয়কালে আপনাকে যে কত ভাবে বিভক্ত করিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। একটী কার্য্যপূর্ণ ভাব সম্পূর্ণ করিয়া অমনি [illegible] ভাবকে

সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার এটী স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অভিনয় ব্যতীত আমি সদাসর্ব্বক্ষণ এক এক রকম ভাবে মগ্ন থাকিতাম।

"মৃণালিনী"তে "মনোরমা"র চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন, তাহা যাঁহারা না মৃণালিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না! একসঙ্গে বালিকা, প্রেমময়ী যুবতী পরামর্শদাত্রী মন্ত্রী, অবশেষে পরম পবিত্র চিত্রে স্বামী সহমরণ অভিলাষিণী দৃঢ়চেতা সতী রমণী; যে কেহ "মনোরমার" অংশ অভিনয় করিবে, তাহাকেই একসঙ্গে এতগুলি ভাব দর্শককে প্রদর্শন করিতে হইবে! গাম্ভীর্য্যের সহিত "পশুপতির" সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বালিকামূর্ত্তি ধরিয়া "পুকুরে হাঁস দেখিগে", বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে কত অভ্যাস ও অচিন্তাসাধ্য তাহা ধারণা করাই কঠিন। গাম্ভীর্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবিকল বালিকাভাব ধারণ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে দর্শকের নিকট অতি হাস্যজনক হইয়া উঠে; "ন্যাকাম" বলিয়া অভিনেত্রী উপহাসাস্পদ হন। সেইকারণে ৺ বঙ্কিমবাবু মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম কখন যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।

আমার অভিনয় সম্বন্ধে কাগজে কলমে যে বিস্তর

সমালোচনা হইত, তাহা বলা বাহুল্য। সমালোচনায় অবশ্যই নিন্দা প্রশংসা উভয়ই ছিল, কিন্তু তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসার কথা কি পরিমাণে ছিল তাহা যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আমি সমালোচনা বড় দেখিতাম না। তাহার কারণ এই যে যদি প্রশংসার কথা শুনিয়া আমার দুর্ব্বলচিত্তে অহঙ্কার আসে তবে তো আমি একবারে নষ্ট হইয়া যাইব। যাহা হউক দয়াময় ঈশ্বর ঐ স্থানটিতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমার এখন যেমন নিজেকে হীন ও অস্পৃশ্য ঘৃণিতা বলিয়া ধারণা আছে, তখনও তাহাই ছিল। আমি দুঃখীদের ন্যায় ভিখারী ছিলাম। তখনকার আমার অভিনয় সম্বন্ধে পরম পূজনীয় স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রিজ্ এণ্ড রায়ৎ" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার এক সপ্তাহের একখানির একটুকু লেখা আমি তুলিয়া দিতেছি—

"For last not least shall we say of Benodini?" She is not only the Moon of Star company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity of reproducing them. She is certainly a Lady of much

refinement of feeling as she shows herself to be one of imitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilasini Karforma, the girl graduate, exhibited so to say an iron grip of the queen phenomenon, the Girl of the Period as she appears in Bengal society. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the suitable forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genius like faith can remove mountains.

ইহার ভাবার্থ এই—

ষ্টার থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গের মধ্যে, শ্রীমতী বিনোদিনী চন্দ্রমা স্বরূপা। বলিতে কি তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা বলিয়া তিনি বহুবিধ চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৎ তৎ চরিত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থা হইয়াছেন। এবং তিনি বিশিষ্টরূপ মার্জ্জিতা প্রকৃতি বলিয়া, কোন অভিনেত্রীই এপর্য্যন্ত তাঁহার মনোহারিত্ব অনুকরণ

করিতে পারেন নাই। বিগত বুধবার (৭ই অক্টোবর ইং ১৮৮৫) তিনি দুইটী বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণরূপ বিসদৃশ চরিত্রের অভিনয় করিয়া, উভয় চরিত্রের সম্যক্ সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষিতা রমণী গ্রাজুয়েড্ বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র অভিনয়ে তিনি আধুনিক বঙ্গ সমাজের শিক্ষিতা মহিলার আদর্শরূপা, অদ্ভুত দৃশ্যের কঠোর ভাব প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আর যে চৈতন্যদেবকে ভগবান জানিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার চরিত্রাভিনয়ে ইঁনি যে প্রকৃতির বহুবিধ সক্ষম শক্তির উপর প্রাধান্য রাখিয়া থাকেন তাহা বিশেষরূপ বুঝিতে পারা যায়। কুমারী বিনোদিনীর পক্ষে এরূপ মহাপুরুষের চরিত্রাভিনয়ে সেই চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ প্রদর্শন, একপ্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপারই বলিতে হইবে, তবে ঐশী প্রতিভা ও বিশ্বাস পর্ব্বতসদৃশ বাধাও অতিক্রম করিয়া থাকে।

আবার কত লোক নিন্দাও করিত, সে নিন্দা অভিনয় সম্বন্ধে নহে। বলিত যে এইরূপ লোকদ্বারা এরূপ উচ্চ অঙ্গের চরিত্র অভিনয় করাই দোষ। যাহার যাহা মনের ভাব তাহা বলিত। আমাদের সময়ে যেমন প্রশংসা ছিল, তেমনি কোনরূপ ত্রুটী হইলে নিন্দার জোরও তদধিক ছিল। অতি সামান্য ত্রুটী হইলে অজস্র কটু কথাদ্বারা গালাগালি দিতেন।

করেন নাই। একপকার "ষ্টার থিয়েটারের" সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও আমার ড্রেস্ করিবার অতিশয় সুখ্যাতি করিতেন। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের নিজ নিজ পোষাকের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন। যেহেতু একজন লোককে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকল দশা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া দর্শক সমীপে উপস্থিত হইতে হয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, গম্ভীর নানারূপ মনের অবস্থা দেখাইতে হইবে, তখন একই জনকে মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গীর ভাবও নানারূপ দেখাইতে হইবে। সেইজন্য পোষাকেরও পরিবর্ত্তন চাই! কেননা "আগে দর্শন ডালি, পিছাড়ি গুণ বিচারি।"

যে সময় আমি থিয়েটারের কার্য্যে জীবিকা অতি-বাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি তো যে সুকার্য্য কিছু করি আর না করি বুদ্ধির বিপাকে প্রবৃত্তির দোষে অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকিব। "ষ্টার থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিবার কালীন এত ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইয়াছিল যে ইহার জের থিয়েটার হইতে অবসর লওয়ার পরও শেষ হয় নাই। কোন এক রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। আমার গুর্ম্মুখ বাবুর আশ্রয় লইবার সময় আমার পূর্ব্ব আশ্রয়দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত অতিশয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম হওয়ায় আমাকে লুকাইয়া

থাকিতে হয়। পরে সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রকাশ হইলে একদিন পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত যুবক আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, যে "বিনোদ, তুমি আমায় প্রতারণা করিয়া তোমার স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইলে; কিন্তু এ তোমার ভুল! তুমি কত দিন লুকাইয়া থাকিবে? আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার শত্রুতা করিব। আমার কথার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না। তুমি ঠিক জানিও আমার কথা মিথ্যা হইবে না। মৃত্যুর পরও তোমায় দেখা দিব জানিও।" আমি তখন একথা বিশ্বাস করি নাই, বোধহয় আমার মুখে একটু অবিশ্বাসের হাসিও দেখা দিয়াছিল; কিন্তু ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন আমি ইহার সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হই। তখন আমি থিয়েটার হইতে অবসর লইয়া ঘরে বসিয়াছিলাম। উক্ত রবিবারে সবেমাত্র আমার ঘরে সন্ধ্যার আলো দিয়া গিয়াছে। আমি সেদিন আলস্য ভাবে বিছানায় সন্ধ্যার সময়ই শয়ন করিয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম না। তবে মনটা কেমন অবসন্ন ছিল, সেইজন্য সন্ধ্যার সময়ই শুইয়াছিলাম, কোন কারণ না থাকিলেও যেন দেহ মন অবসন্ন হইয়া আসিতে ছিল। আমি অর্দ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে আমার ঘরের প্রবেশদ্বারের দিকে

চাহিয়াছিলাম, এমন সময় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে সেই বাবুটি মলিন ভাবে আমার ঘরের সম্মুখের দ্বার দিয়া অতি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আসিয়া আমার মাথার দিকে খাটের ধারে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। এবং আমায় সম্বোধন করিয়া অতি ধীর ও শান্ত ভাবে বলিলেন, যে "মেনি, আমি আসিয়াছি!" তিনি প্রায়ই আমায় "মেনি" বলিয়া ডাকিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে যখন তিনি ঘরের মধ্যে আসেন তখন আমার দৃষ্টি বরাবর তাঁর দিকেই ছিল। তিনি খাটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র আমি চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "একি! তুমি আবার কেন আসিয়াছ?" তিনি যেন কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি যাইতেছি তাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা বলিবার সময় কোনরূপ চঞ্চলতা বা শব্দ টানা কিছুই ছিল না; যেন মাটির তৈয়ারী পুতুলের মতন মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল। আমার একবারমাত্র মনে হইল যে তিনি একটু সরিয়া আমার দিকে হাত তুলিলেন। একটু ভয়ও হইল, আমি ভয়ে কিছু পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া বলিলাম, "সে কি! তুমি কোথায় যাইতেছ? আর এত দুর্ব্বল হইয়াছ কেন?" তিনি যেন আরও বিষণ্ণ ও স্থির হইয়া বলিলেন, "ভয় পাইওনা আমি তোমায় কিছু বলিব না; আমি বলিয়া-

ছিলাম যে আমি যাইবার সময় তোমায় বলিয়া যাইব, তাই বলিতে আসিয়াছি, আমি যাইতেছি!” এই কথা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সেই দরজা দিয়াই চলিয়া যাইলেন!

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, “মা উপরে কে আসিয়াছিল?” মা বলিলেন, “কে উপরে যাইবে? আমি তো এই সিঁড়ির নীচেই বসিয়া রহিয়াছি।” আমি বলিলাম, “হাঁ মা, অমুক বাবু যে আসিয়াছিলেন!” আমার মা হাসিয়া বলিলেন, “দরজায় মিশির বসিয়া আছে, আমি সদর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি; কে আসিবে? তুই স্বপ্ন দেখ্‌লি নাকি? (মিশির আমাদের দরওয়ান) কোন ব্যক্তি বাহির হইতে আসিলে অগ্রে সে খবর দেয়।” তখন আর কিছু না বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া মনে করিতে লাগিলাম, যে কি হইল? সত্য কি স্বপ্ন দেখিলাম নাকি? তাহার পর দিবস সন্ধ্যার সময় আমি বাটীর ভিতর বারান্দায় বসিয়া আছি, আর আমার মাতা কি কার্য্যবশতঃ সদর দরজায় গিয়াছিলেন। এমন সময় রাস্তার মধ্য হইতে একব্যক্তি একখানা ঠিকাগাড়ীর ভিতর হইতে বলিয়া

উঠিলেন, "ওগো গিন্নি! শুনিয়াছ, গত কল্য সন্ধ্যার সময় বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" সেই লোকটা মৃত ব্যক্তির একজন কর্ম্মচারী। তাহার কথা রাস্তা হইতে আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলাম সত্যই কি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি সত্যপালন করিয়া গেলেন। পূর্ব্ব দিনের স্মৃতি জাগিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার শরীর যেন বরফের মত শীতল অনুভব হইতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা লিখিবার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে, মৃত্যুর পর মানুষ যে স্ব-রূপে কোন জীবিত ব্যক্তির নয়নগোচর হইতে পারে, ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু অন্য কেহ কখন যদি এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের বিশ্বাসকে আরও একটু বলবান করিবার জন্য ইহা লিখিলাম।

আর একটী এরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা আমার একজন আত্মীয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যদিও সে ঘটনার সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি সাদৃশ্য বোধে লিখিলাম।

আমার কনিষ্ঠা কন্যার যখন মৃত্যু হয়, সেইদিন ঠিক সেই সময়ে আমার সেই কন্যা অথবা তাহার ছায়াময়ী মূর্ত্তি সেই আত্মীয়টীর প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমিও যেমন আলস্য-জড়িত-দেহে শুইয়াছিলাম মাত্র, তিনিও সেইরূপ

সুষুপ্তি হইতে অন্তরে ছিলেন। আমার কন্যা-মূর্ত্তিকে দেখিয়া বলেন, "একি ! কালো ! তুই এখানে ?" তিনি তখন কলিকাতার বাহিরে বাহিরে বাস করিতেছিলেন। মূর্ত্তি উত্তর করিল, "হ্যাঁ !" আত্মীয় তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ! এত অসুস্থ শরীরে তুই এলি কি করে মা ?" ছায়াময়ী উত্তর করিল, "এলুম !" দুটী তিনটী কথা কহিয়া তিনি যেমন উঠিয়া বসিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না ! নিমেষে অদৃশ্য হইল ! মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম মৃত্যু ! কিন্তু তাহার শেষ গতি কি তাহার মীমাংসা কে করিবে ? বহু দার্শনিকের বহু প্রকার সিদ্ধান্ত ! কাজেই লেখনী এখানে মূক ! তবে মৃত মনুষ্য যে কথা কহিতে পারে ইহাও আশ্চর্য্য। হইতে পারে আমার ভ্রম এবং অনেকেও তাহা বলিতে পারেন। যদি কেহ কখন মৃত আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন, তবে তিনিই আমার কথা সত্য বলিয়া মানিতে পারেন ! কিন্তু আত্মা যদি অবিনাশী হয় এবং ইচ্ছাশক্তিতে যদি দেহের গঠন হয় তবে এইগুলি বোধ হয় অবিশ্বাস্য নয়।

আমার এই ক্ষুদ্র কথার ভিতর ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে লিখিবার অন্য উদ্দেশ্য নাই ; তবে, যে ষ্টার থিয়েটার স্বদেশে, বিদেশে, সুযশে, সুনামে পরিপূর্ণ ছিল—আমি এক্ষণে সে ষ্টার থিয়েটার হইতে বহু দূরে ; হয় তো আমার স্মৃতি পর্য্যন্ত এক্ষণে তাহার নিকট

হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেননা সে বহু দিনের কথা! চিরদিন কখন সমান যায় না! আজ জগৎ জোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে "ষ্টার থিয়েটারের" নাম উন্নত বক্ষে অবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয়া বলিয়া মনে করিত! এক্ষণে শত আরাধনায় যাহাদের একবারমাত্র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয় তো কোন আঁধারের কোণে কাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। তাই বলি, চিরদিন কখন সমান যায় না! লোকে দিন পায়, আবার সেদিনও চলিয়া যাইতে পারে! হৃদয় শোকে তাপে বিজড়িত হইলে, যাতনায় অস্থির হইলে, যাহাদের আপনার মনে করা যায় বা যাহারা এক সময় অতিশয় আত্মীয়তা জানাইয়া ছিল, তাহাদের নিকট সহানুভূতি পাইতে আশা করে, তাই আপনা হইতে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে আসে! সেজন্য পূর্ব্ব কথা তুলিলাম। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। আর আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণা স্ত্রীলোকের এক্ষণকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কোন অতিরঞ্জিত কথা বলিবার সাহস কেন হইবে, আর আমি গর্ব্ব করিয়াও কোন কথা বলি নাই! যে স্বার্থ আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিয়া ছিলাম, তাহার জন্য অপরে বাধ্য নহে। শুদ্ধ বুদ্ধিহীনা স্ত্রীস্বভাবের দুর্ব্বলতা বশতঃ একথা উঠিল; নচেৎ

এ ক্ষুদ্র কথা উল্লেখ যোগ্যও নহে এবং ইহা বহুদিনের কথা বলিয়া হয় তো কোন কোনটা গোলও হইতে পারে, ইহার জন্য এখন যাঁহারা আমার সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়াছেন তাঁহারা না বিরূপ হয়েন। বহুদিনের ঘটনা মনে করিয়া লিখিতে গেলে হয় তো তাহার দু একটী গোলও হইতে পারে।

এই ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে জীবনের প্রথম উচ্ছাসিত অবস্থায় দিন কাটিয়া গিয়াছিল। বাহিক অবস্থা তো বড়ই ঘৃণিত, পতিত। কিন্তু যাঁহারা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখে ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ পুস্তক পাঠ না করেন। কেন না রমণী জীবনে যাহা প্রধান ক্ষত স্থান তাহাতে লবণ দিয়া নাই বিরক্ত করিলেন। যাঁহারা দুঃখিনী হতভাগিনী বলিয়া একটুখানি দয়া করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন তাঁহারা যেন এ হৃদয়ের মর্ম্ম ব্যথা বুঝেন। এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্ম্মভেদী যাতনার বোঝা হাসিমুখে চাপা, কত নিরাশা হা হুতাশ, দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জ্বলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে—তাহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে; কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী-হৃদয় লইয়া সংসারে

আসে। যে রমণী স্নেহময়ী জননী, তাহারাও সেই রমণীর জাতি! যে রমণী জ্বলন্ত অনলে পতি সনে হাসিমুখে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী-জাতি! তবে গোড়া হইতে পাষাণে পড়িয়া আছাড়্ পিছাড়্ খাইতে খাইতে একেবারে চুম্বক ঘর্ষিত লৌহ যেরূপ স্বর্ণ হয়, আমরাও সেইরূপ পাষাণে ঘর্ষিত হইয়া পাষাণ হইয়া যাই! আরও একটা কথা বলি সকলেই সমান নহে; যে জীবন অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহা এক রকম নির্জীব ভাবে জড় পদার্থের মত চলিয়া যায়! কিন্তু যে জীবন দূরে দূরে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টি করিতেছে অথচ পতিত হইয়া আত্মীয়, সমাজ, স্বজন-বন্ধন হইতে বঞ্চিত তাহাদের জীবন যে কত দূর দুঃখময়, তাহা যে কত দূর কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা

মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন কি? যাঁহারা লোকালয়ে দয়া দেখাইয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা করিয়া বিশ্বাসবতী অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। ছলনার ভালবাসা দেখাইয়া আত্ম-সমর্পণকারী রমণী হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছুই দোষী নহেন! দোষ কাহাদের? যে সকল হতভাগিনীরা সুধাস্বাদে বিষপান করিয়া চিরজীবন অন্তর্দাহিত হইয়া হৃদয়-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে তাহাদের কি? যে ভাগ্যহীনা রমণীরা এইরূপে প্রতারিত হইয়া আপনাদের জীবনকে চির শ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে যে লাঞ্ছনা জীবন কত যন্ত্রণাদায়ক! যাতনার জীবন, তাহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। আবার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য ঐ অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন! যে ভাগ্যহীনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাঁহারা যদি তাহাদের সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের সৎপথে রাখিবার জন্য কোন বিদ্যালয়ে বা কোন কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে, তখন ঐ সমাজপতিরাই প্রাণ চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সেই স্থান হইতে দূর করিতে যত্নবান

হন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞতার প্রভাবে অভাগা বালক বালিকারাও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পাপ পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়া বিষ-দৃষ্টির দ্বারা জগতের দিকে চাহিয়া থাকে। সুকুমার-মতি-বালিকাদের পবিত্র সরলতা হৃদয় হইতে যাইতে না যাইতে তাহাদের হৃদয়ে মধুরতা সমাপ্ত হইতে না হইতে, তাহাদের কচি হৃদয়খানি অবিশ্বাস অনাদরের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে। এমন পুরুষপ্রবর অনেকে আছেন, যে নিজের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আত্মদমনে অক্ষম হইয়া, একজন অবলার চিরজীবনের শান্তি নষ্ট করিয়া—সমাজে ঘৃণিত, স্বজনে বঞ্চিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিয়া পৌরুষ জ্ঞান করেন। হায়! ভাগ্যহীনা রমণী, কি ভুল করিয়াই আত্মবিনাশ করে! পঙ্কে যে পদ্ম ফুল ফুটে তাহা দেবতা মস্তকে পাতিয়া লন; কেননা তিনি ঈশ্বর! আর মানুষেরা সুকুমার-মতি-বালিকাগণকে লতা হইতে বিচ্যুত করিয়া পদে দলিত করেন, কেননা ইহারা মানুষ! যাক্! যে ভুল সারাজীবনকে বিষময় করে, তাহা যে কি ভয়ানক ভুল, তাহা এই ভাগ্যহীনারাই বুঝে! শত দোষ করিলে পুরুষের ক্ষতি নাই; কিন্তু "নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।"

এক্ষণে নানা কারণ বশতঃ থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবন নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতে

ছিলাম। এই নানা কারণের প্রধান কারণ যে আমায় অনেক রূপে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আমার সহিত যে সকল ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। থিয়েটার বড় ভালবাসিতাম তাই কার্য্য করিতাম। কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই! তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম। এই দুঃখময় জীবনের একটী সুখের অবলম্বন পাইয়াছিলাম। একটী নির্ম্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া এ কলঙ্কিত জীবনকে শান্তিদান করিতে ছিল। কিন্তু এই দুঃখিনীর কর্ম্মফলে তাহা সহিল না! আমায় শাস্তির চরমসীমায় উপস্থিত করিবার জন্য সেই অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পারিজাতটী আমায় চিরদুঃখিনী করিয়া এই নৈরাশ্যময় জীবনকে জ্বালার জ্বলন্ত পাবকে ফেলিয়া স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সে আমার বড় আশা ও আদরের ধন ছিল। তাহার সরল পবিত্র চক্ষু দুটীতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িত! সেই স্নেহময় নির্ভর পরায়ণা বালিকাটীতে দেবতার পবিত্রতা, ফুলের অসীম সৌন্দর্য্য রাশি, জাহ্নবীর পবিত্র কুল কুল ধ্বনি, বিকশিত পদ্মের ন্যায়, মধুময় হৃদয়ের পবিত্রতা রাশি সদাই উথলিয়া আমার জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিত। তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা-রহিত নির্ম্মলতা কত উচ্চে আমাকে আকর্ষণ করিত। এ দেবতার দয়ার দান অভাগিনীর

ভাগ্য দোষে দেবতার দান সহিল না। আমার সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া আমার অন্ধকার হৃদয়ে বিষময় বাতি জ্বালিয়া দিয়া সে আমার চলিয়া গিয়াছে! এখন আমি একা পৃথিবীতে, আমার আর কেহ নাই, সুধুই আমি একা! এখন আমার জীবন শূন্য মধুময়! আমার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, কার্য্য নাই, কারণ নাই! এই শেষ জীবনে ভগ্নহৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশা, উদ্যম, ভরসা, উৎসাহ, প্রাণময়ী সুখময়ী কল্পনা, সকলই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! অহরহঃ শুধু যন্ত্রণার তীব্র দংশন! এই আমি—অসীম সংসার প্রান্তরে একটী সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছাওয়ায় বসিয়া কতক্ষণে চির শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই সুবিশাল সুশীতল তরুই আমার এই জীবন্মৃত অবস্থার আশ্রয় স্থান! আমার অন্তর ব্যথা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আমি ইহা লিখিলাম। কেননা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আর আমার ভয় নাই। লোকই সে ভয় দূর করিয়াছে। তাঁহাদের নিন্দা বা সুখ্যাতি আমার নিকট সকলই সমান! গুণী, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লিখেন লোক শিক্ষার জন্য, পরোপকারের জন্য, আমি লিখিলাম, আমার নিজের

সান্ত্বনার জন্য, হয় তো প্রতারণা বিমুগ্ধ নরক পথে পদ বিক্ষেপোদ্যতা কোন অভাগিনীর জন্য। কেননা আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিতা, সমাজ বর্জ্জিতা, বারবনিতা; আমার মনের কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই! তাই কালি কলমে লিখিয়া আপনাকে জানাইলাম। আমার কলুষিত কলঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় এই নির্ম্মল সাদা কাগজকেও কলঙ্কিত করিলাম। কি করিব! কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ব্যতীত আর কি আছে?

প্রথম খণ্ডের শেষের দুটী কথা।

এতদিনে আমার কর্ম্মতরু সম্পূর্ণরূপে ফলফুলে পূর্ণ হইয়া আমার অদৃষ্টাকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছাইয়া উঠিল। এইবার সব ঠিক্‌!

কারণ কি তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। অনেক দিবস হইল ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমার নাট্যজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি; তিনি ইহার প্রতি ছত্র, প্রতি লাইন দেখিয়া শুনিয়া দেন; তিনি দেখিয়া ও বলিয়া দিতেন মাত্র, কিন্তু একছত্র কখন লিখিয়া দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে আমি সরলভাবে সাদা ভাষায় যাহা লিখি তাঁহার নিকট সেই সকল বড় ভালই বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে আমার জীবনী লিখিয়া **আমার কথা** নাম দিয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করি। তিনিও এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে রোগ যাতনা ভোগ করিবার জন্য ও নানা ঝঞ্ঝাটে কতদিন চলিয়া যায়। পরে তাঁহার পরিচিত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ছাপাইবার জন্য কল্পনা করেন। কিন্তু আমার কতক অসুবিধা বশতঃ হাঁ—না, এইরূপ নানা কারণে তখন হয় নাই। তাহার পর আমি মরণাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া চারি মাস শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকি; আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না; শত শত সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাবিধ চিকিৎসা শুশ্রূষা, দৈবকার্য্য করিয়া, প্রায় অনাহারে, অনিদ্রায় বহু অর্থ ব্যয়ে দেবতাস্বরূপ আমার আশ্রয়দাতা দয়াময় মহামহিমান্বিত মহাশয় আমায় মৃত্যুমুখ হইতে কাড়িয়া লইলেন। ডাক্তার, সন্ন্যাসী, ফকির, মোহন্ত, দৈবজ্ঞ, বন্ধু বান্ধব সকলে একবাক্যে বলিয়াছিলেন, যে "মহাশয় শুধু আপনার ইচ্ছার জোরে (*Will force*) ইনি জীবন পাইলেন।" সেই দয়াময় তাঁহার ধন সম্পত্তি, তাঁহার মহজ্জীবন একদিকে; আর এই ক্ষুদ্র পাপিয়সীর কলঙ্কিত জীবন একদিকে করিয়া দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন। আমি ব্যাধির যাতনায় বিগত নাড়ী হইয়া জ্ঞান হারাইলে, তিনি আমার মস্তকে হাত রাখিয়া স্নেহময় চক্ষুদুটী আমার চক্ষের উপর রাখিয়া, দৃঢ়ভাবে বলিতেন, "শুন, আমার দিকে চাহ; অমন করিতেছ কেন? তোমার কি বড় যাতনা হইতেছে? তুমি অবসন্ন হইও না! আমি জীবিত থাকিতে তোমায় **কখন মরিতে দিব না।** যদি তোমার আয়ু না থাকে তবে দেবতা সাক্ষী, ব্রাহ্মণ সাক্ষী,

তোমার এই মৃত্যু তুল্য দেহ সাক্ষী, আমার অর্দ্ধেক পরমায়ু তোমায় দান করিতেছি, তুমি সুস্থ হও। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি কখনই **মরিতে পাইবেনা।**”

সেই সময় তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অমৃতময় স্নেহপূর্ণ জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আমার রোগক্লিষ্ট যাতনাময় দেহ অমৃতধারায় স্নাত করাইয়া শীতল করিয়া দিত। সমস্ত রোগ-যাতনা দূরে চলিয়া যাইত। তাঁহার স্নেহময় হস্ত আমার মস্তকের উপর যতক্ষণ থাকিত আমার রোগের সকল যাতনা দূরে যাইত।

এইরূপ প্রায় দুই তিনবার হইয়াছিল; দুই তিনবারই তাঁহারই হৃদয়ের দৃঢ়তায় মৃত্যু আমায় লইতে পারে নাই। এমন কি শুনিয়াছি অকসিজেন গ্যাস দিয়া আমায় ১২।১৩ দিন রাখিয়া ছিল। যাঁহারা সে সময় আমার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা এখনও সকলে বর্ত্তমান আছেন। সেই সময় মাননীয় বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়, উপেনবাবু, কাশীবাবু প্রভৃতি প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া আমায় যত্ন করিতেন; সকলেই এ কথা জানিত।

বুঝি এইরূপ সুস্থদেহে অসীম যাতনার বোঝা বহিতে হইবে বলিয়া, অতি হৃদয়শূন্য ভাবে লোকের নিকট উপেক্ষিত হইতে হইবে বলিয়া, অবস্থার বিপাকে এইরূপ দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইবে বলিয়া; অসহায় অবস্থায় এইরূপ অসীম যাতনার বোঝা বুকে করিয়া সংসার সাগরে ভাসিতে

হইবে বলিয়া, আমার দুরাদৃষ্ট তাঁহার বাসনার সহিত যোগ দিয়াছিল। বোধহয় তাহাতেই সেই সময় আমার মৃত্যু হয় নাই। অথবা ঈশ্বর তাঁহার পরম ভক্তের বাক্যের ও কামনার সাফল্যের জন্যই আমায় মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া দিলেন। কেননা আমার হৃদয়-দেবতা তিলেকে শতবার বলিতেন, যে "সংসারের কাজ করি সংসারের জন্য; শান্তি তো পাইনা; তাই বলিতেছি যে তুমি আমার আগে কখন মরিতে পাইবে না।" আমি যখন তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরে বলিতাম, এখন আর ও সকল কথা তুমি আমায় বলিও না। ত্রিসংসারে এ হতভাগিনীর তুমি বই আশ্রয় নাই। এ কলঙ্কিনীকে যখন সংসার হইতে তুলে আনিয়া চরণে আশ্রয় দিয়াছিলে তখন তাহার সকলই ছিল! মাতামহী, মাতা, জীবন জুড়ান কন্যা, রঙ্গভূমের সুখ-সৌভাগ্য, সুযশ, আশাতীত সম্পদ, বঙ্গ রঙ্গভূমের সম-সাময়িক বন্ধুগণের অপরিসীম স্নেহ মমতা সকলই ছিল, তোমারই জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি; তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ফেলে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব! তিনি হাসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, যে "সেজন্য ভেবনা, আমার অভাব ব্যতীত তোমার অন্য কোন অভাবই থাকিবে না। এমন বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই যে এতদিন তোমায় এত আদরে, এত যত্নে আশ্রয় দিয়া, তোমার এই রুগ্ন, অসমর্থ অবস্থায় তোমার শেষ

জীবনের দারুণ অভাবের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইব। তাহার প্রমাণ দেখ সে আমার আত্মীয়দিগের সহিত একভাবে তোমায় আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। এত জেনে শুনে সে তোমায় বঞ্চিত করিবে—আমার অভিশাপে যে উৎসন্ন যাইবে!

তাঁহার মত সহৃদয় দয়ালয় যাহা বলিবার তাহা বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে আমার অদৃষ্ট, তীক্ষ্ণ অসি হস্তে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার জীবনভরা সমস্ত আশাকে ছেদন করিতেছে! আজ তিন মাস হইল এই অসহায়া অভাগিনী কাহারও নিকট হইতে তিন দিনের সহানুভূতি পাইল না; অভাগিনীর ভাগ্য! দোষ কাহারও নয়—কপাল! প্রাক্তনের ফল!! পাপিনীর পাপের শাস্তি!!!

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বৎসরাধিক উত্থানশক্তিহীন হইয়া জড়বৎ ছিলাম। পরে আমায় চিকিৎসকদিগের মতানুযায়ী বহুস্থানে, বহু জল-বায়ু পরিবর্তন করাইয়া, হৃদয়দেবতা আমার সাস্থ্য সম্পূর্ণ-রূপে দান করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ নানা অসুবিধায় এই পুস্তক তখন ছাপান হইল না। ৺ গিরিশবাবুও দারুণ ব্যাধিতে স্বর্গে গমন করিলেন। তিনিও আমায় বলিয়াছিলেন, যে "বিনোদ! তুমি আমার নিজের হাতের প্রস্তুত, সজীব প্রতিমা!

তোমার জীবন-চরিতের ভূমিকা আমি স্বহস্তে লিখিয়া তবে মরিব"; কিন্তু একটা কথা আছে, যে "মানুষ গড়ে, আর বিধাতা ভাঙ্গে," (*"Man proposes but God disposes"*) আমার ভাগ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

পরে ভাবিলাম যে যাহা হয় হইবে; বই হউক আর নাই হউক, আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা বড়ই ছিল যে আমি আমার অমৃতময় আশ্রয়-তরুর সুশীতল সুধামাখা শান্তি ছাওয়াটুকু এই বেদনাময় ব্যথিত বুকের উপর প্রলেপ দিয়া চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িব; ঐ নিস্বার্থ স্নেহ ধারার আবরণে আমার কলঙ্কিত জীবনকে আবরিত রাখিয়া চলিয়া যাইব। ওমা! কথায় আছে কিনা? যে "আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।" একটী লোক একবার তাহার অদৃষ্টের কথা গল্প করেছিল, এখন আমার তাহা মনে পড়িল। গল্পটী এই:—

উপযুক্ত লেখাপড়া জানা একটি লোক স্বদেশে অনেক চেষ্টায় কোন চাকুরী না পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিল। একদিন তাহার একটি বন্ধু বলিলেন, যে "বন্ধো! এখানে তো কোন সুবিধা করিতে পারিতেছ না, তবে ভাই একবার বিদেশে চেষ্টা দেখনা।" তিনি অনেক কষ্টে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। সেখানেও কয়েক দিন বিধিমতে চেষ্টা করিয়া

কিছু উপায় করিতে না পারিয়া, একদিন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া এক মাঠের উপর বৃক্ষ তলায় ক্লান্ত হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে রৌদ্রের উত্তপ্ত বাতাসের সহিত পশ্চাৎ দিকে কে যেন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতেছে। সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?" উত্তর পাইলেন, "তোমার অদৃষ্ট"। তিনি বলিলেন, "বেশ বাপু! তুমিও জাহাজ ভাড়া করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছ ? তবে চল, দেশে ফিরিতেছি, সেইখানেই আমায় লইয়া দড়িতে জড়াইয়া লাট্টু খেলিও।"

আমিও একদিন চমকিত হইয়া দেখি যে আমার অদৃষ্টের তাড়নায়, আমার আশ্রয় স্বরূপ সুধামাখা শান্তি-তরু মহাকালের প্রবল ঝড়ে কাল-সমুদ্রের অতল জল মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যাইল! আমার সম্পূর্ণ ঘোর ছাড়িতে না ছাড়িতে দেখি যে আমি এক মহাশ্মশানের তপ্ত চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি। আবাল্যকাল হইতে যে সকল হৃদয় অসীম যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া চিতার ছাইয়ে পরিণত হইয়াছে; তাহারাই আমার চারিধার ঘেরিয়া আমার বুকের বেদনাটাকে সহানুভূতি জানাইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "দেখ, কি করিবে বল ? উপায় নাই! বিধাতা দয়া করেনা, বা দয়া করিতে পারেনা। দেখ, আমরাও জ্বলিয়াছি,

পুড়িয়াছি, তবুও যায় নাই গো! সে সব জ্বালা যায় নাই! শ্মশানের চিতা ভস্মে পরিণত হয়েও সে স্মৃতির জ্বালা যায় নাই! কি করিবে? উপায় নাই!

তবে যদি কোন দয়াময় দেবতা, মানুষ হইয়া বা বৃক্ষরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন, তাঁহারা কখন কখন তোমার মত হতভাগিনীকে শান্তি-সুধা দানে সান্ত্বনা দিতে পারেন। তাঁরা দেবতা কি না? পৃথিবীর লোকের কথার ধার ধারেন না। আর কুটিল লোকের কথায় তাঁহাদের কিছু আসে যায় না! সূর্য্যের আলোক যেমন দেব-মন্দির ও আঁস্তাকুড় সমভাবেই আলোকিত করে—ফুলের সৌরভ যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সমভাবে গন্ধ বিতরণ করে—ইঁহারাও তেমনই সংসারের হিংসুক, নিন্দাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর লোকদিগের নিন্দা বা সুখ্যাতির দিকে ফিরেও চাহেন না।

তাঁহারা দেবলোক হইতে অপরিসীম স্নেহপূর্ণ সুধা-মাখা আত্মানন্দময় হৃদয় লইয়া মর্ত্তভূমে দুঃখীর প্রতি দয়া করিবার জন্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহৃদয়তা দেখাইবার কারণ, বন্ধুর প্রতি সমভাবে সহানুভূতি করিবার ইচ্ছায়, সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ বাৎসল্য স্নেহ প্রদানে লালন পালন করিতে, পত্নীর প্রতি সতত প্রিয়ভাষে প্রেমদানে তুষ্ট করিতে, আজ্ঞাকারীর ন্যায় সকল অভাবপূর্ণ করিবার জন্য সতত প্রস্তুত! প্রণয়িনীর নিকট অকাতরে প্রেমময়

হৃদয়খানি বলি দিতে—ভালবাসার আকাঙ্ক্ষিতাকে আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসিতে—আশ্রিতকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিতে—পাত্রাপাত্র অভেদজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষিতের অভাবপূর্ণ করিবার জন্য অযাচিতভাবে লুকাইয়া দান করিতে (কত সঙ্কুচিত হ'য়ে, যদি কেহ লজ্জা পায়)—ভগবানে অটল ভক্তি রাখিবার বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে—আত্মসুখ ভুলিয়া দেবসেবা ব্রতে সুখী হইতে—প্রাণ ভরিয়া অক্লান্ত হৃদয়ে পরোপকার করিতে আইসেন। ওগো তোমাকে আর কতই বা বলিব! তাঁহাদের তুলনা সুধু তাঁহারাই—যাহা লইয়া দেবলোকে দেবত্ব গঠিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেখানকার সেই সকলই লইয়া এই যন্ত্রণাময় মরজগতে অতি দুঃখীকে দয়া করিতে আইসেন। সংসারের গতিকে ক্রূর হৃদয়ের বিষদৃষ্টিতে যখন সেই মানবরূপ দেবতা বা তরুবর অবসন্ন হইয়া পড়েন, তখনই চলিয়া যান। যে অভাগা ও অভাগিনীরা সেই পবিত্র ছাওয়ার কোলে আশ্রয় পাইয়া চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়ে, সংসারের যাতনাময় কোলাহলে আর না জাগিয়া উঠে তাহারাই হয় তো সেই দেবহৃদয়ের পবিত্রতার স্পর্শে শান্তিধামে যাইতে পারে; আবার যাহারা অদৃষ্টের দোষে সেই শান্তি-সুধাময় তরুচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারাই এই তোমার মত যাতনায় পোড়া শ্মশানের চিতাভস্মের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। তোমার মত দুর্ভাগিনীদের

আর উপায় নাই গো! যাহারা অমূল্য রত্ন পাইয়াও হারাইয়া ফেলে, তাদের উপায় নাই। আর তোমাদের মত পাপিনীদের হৃদয় বড় কঠিন হয় ও হৃদয় শীঘ্র পুড়েও না, ভাঙ্গেও না, অত জ্বালায় লোহাও গলিয়া যায়। তোমার মত হতভাগিনী বুঝি আমাদের মধ্যেও নাই, ও রকম কঠিন পাষাণ হৃদয়ের কোন উপায় নাই; তা কি করিবে বল? এই সকল কথা বলিয়া সেই জ্বালা যন্ত্রণায় পোড়া হৃদয়ের চিতাভস্মগুলি হায়! হায়! করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই ভস্ম হইতে হায়! হায়! শব্দ শুনিয়া আমার তখন ক্ষণিকটা চৈতন্য হইল। মনের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাতের মত আঘাত লাগিল, মনে পড়িল যে আমিও তো ঐরূপ একটি সুধাময় তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম। তবে বুঝি সে তরুবরটী ঐ রকম দেবতাদের জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত "দেবতরু।" ঐ চিতাভস্মগুলি যে সকল গুণের কথা বলিলেন, তাহা অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে সেই দেবতার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। দয়ারসাগর, সরলতার আধার, আনন্দের উচ্ছ্বাসিতপূর্ণ ছবি, আত্মপরে সমভাবে প্রিয়বাদিতা, সতত হাস্যময়, প্রেমের সাগর, আপনাতে আপনি বিভোর, কনকোজ্জ্বল বরণ সুন্দর, রূপে মনোহর, বিনয় নম্রতা বিভূষিত, সুধামাখা তরুবর! শুনিয়াছিলাম যে দেবতারাই অনাথ প্রাণীকে সময়ে

সবারে দয়া করিতে কৃষ্ণ বা মানবরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র, গুহক চণ্ডালকে মিতে বলে স্নেহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দাসী-পুত্র বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেয়েছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবও যবন হরিদাসকে দয়া করিয়াছিলেন। দুঃখী অনাথকে দয়া করিতে কি দোষ আছে গা? কাঙ্গালকে আশ্রয় দিলে কি পাপ হয় গা? লোকের স্পর্শে কি পরেশ পাথর মলিন হয়? না কয়লার সংস্রবে হীরকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে?

স্বর্গের চাঁদ যে পৃথিবীর কলঙ্কের বোঝা বুকে করিয়া সংসারকে সুশীতল আলোক বিতরণে সুখী করিতেছেন, পৃথিবীর লোকেরা তাহারই আলোকে উৎফুল্ল হইয়া "ঐ কলঙ্কি চাঁদ ঐ কলঙ্কি চাঁদ" বলিয়া যতই উপহাস করিতেছে, তিনি ততই রজত ধারায় পৃথিবীতে কিরণ-সুধা ঢালিয়া দিতেছেন; আর স্বর্গের উপর বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন।

আমিও তো তবে ঐ দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কৈ সেই আমার আশ্রয়স্বরূপ দেবতা? কৈ—কোথায়? আমার হৃদয়-মরুভূমির শান্তি-প্রস্রবণ কোথায়? হু হু করিয়া শ্মশানের চিতাভস্ম মাখা বাতাস উত্তর করিল, "আঃ পোড়া কপালি, এখনও বুঝি চৈতন্য হয় নাই? ঐ শুন চৈত্র মাসের ৮ বাসন্তি পূজার নবমীর

দিনে, মহাপুণ্যময় শ্রীরাম নবমীর শুভ তিথির প্রভাত-কালে ৭টার সময় সূর্য্যদেব অরুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, রক্তিম ছটায় কিরণ বহিয়া, পবিত্র জাহ্নবীকূল আলোকিত করিয়া, ধরায় নামিলেন কেন, তাহা বুঝি দেখিতেছ না? পবিত্র ভাগিরথী আনন্দে উথলিয়া, ভাসিয়া হাসিয়া, সাগর উদ্দেশে কেন ছুটিতেছে, তাহাও বুঝি দেখিতেছ না? ৬ জীউ; গোপাল-মন্দির হইতে ঐ যে পূজারি মহাশয় ৬ জীউর মঙ্গল-আরতি সমাধা করিয়া প্রসাদি পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া ঐ কাহাকে মঙ্গল-আরতি করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, চারিদিকে এত হরিসঙ্কীর্ত্তন, হরিনামধ্বনি, এত ব্রহ্মনামধ্বনি কেন গা? একি? সুরধুনির তীরে দেবতারা আসিয়াছেন নাকি? প্রভাতি-পুষ্পের সৌরভ বহিয়া বায়ু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? দেবমন্দিরে এত শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি কেন? কিরণ ছটা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যদেব কাহার জন্য স্বর্গ হইতে রথ লইয়া আসিয়াছেন? তাহাও কি বুঝিতেছ না?"

চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি, 'ওমা! আমারই আজ ৩১ বৎসরের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইল! এই দীনহীনা দুঃখী প্রাণী আজ ৩১ বৎসরের যে রাজ্যেশ্বরীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল, মহাকালের ফুৎকারে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা কালসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল! অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মস্তকে প্রস্তরের আঘাত পাইলাম, শত

সহস্র জোনাকি-স্তূপ যেন চক্ষের উপর দিয়া ঝক্ মকিয়া চলিয়া গেল।

আবার যখন চৈতন্য হইল, তখন মনে পড়িল যে আমি "আমার কথা" বলিয়া কতকগুলি মাথামুণ্ড কি লিখিয়াছিলাম। তাহার শেষেতে এই লিখিয়াছিলাম যে আমি "মৃত্যুমুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। মৃত্যুর জন্য তো লোকে আশা করিয়া থাকে, সেও তো জুড়াবার শেষের আশা!

ওগো! আমার আর শেষও নাই, আরম্ভও নাই গো! ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের ১৪ই বুধবারের প্রাতঃকালে সে আশাটুকু গেল।

মরিবার সময় যে শান্তিটুকু পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহাও গেল, আর তো একেবারে মৃত্যু হবে না গো, হবে না! এখন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর যাতনাটি বুকে করিয়া চিতাভস্মের হায়—হায় ধ্বনি শুনিতেছি। আর দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া এই মহাপাতকিনীর কর্ম্মফলরূপ সুবিশাল শাখা প্রশাখা ফুল ও ফলে পূর্ণতরুতলে বসিয়া আছি গো!

পৃথিবীর ভাগ্যবান লোকেরা শুন, শুনিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইও। আর ওগো অনাথিনীর আশ্রয়-তরু, স্বর্গের দেবতা, তুমিও শুন গো শুন! দেবতাই হোক্, আর মানুষই হোক্; মুখে যাহা বলা যায় কার্য্যে করা বড়ই দুষ্কর! ভালবাসায় ভাগ্য ফেরেনা গো, ভাগ্য

ফেলেনা ।। ঐ দেখ আবার চিতাভস্মগুলি ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে, আর হায় হায় করিতেছে।

এই আমার পরিচয়। এখন আমি আমার ছায়া লইয়া শ্মশানের মাঝখানে চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি। এখন যেমন একটা অবাক্তার জিনিস দেখিলে কেহ রাম, রাম, কেহ কেহ শিব, শিব, কেহ বা দুর্গা, দুর্গা বলেন, আবার কেহ মুখ ঘুরাইয়া লইয়া হরি, হরি বলিয়া পবিত্র হয়েন। যাহার যে দেবতা আছেন, তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই মহা পাতকীর পাপ কথাকে বিস্মৃত হউন। ভাগ্যহীনা, পাতকী কাঙ্গালিনীর এই নিবেদন। ইতি—১২ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল, বুধবার।